সাংখ্য-দর্শন

বটব্যাল গ্রামীন

ীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার এম্. এ., সি. এস্.,

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্ট,

বিরচিত

দ্বিতীয় সংস্করণ
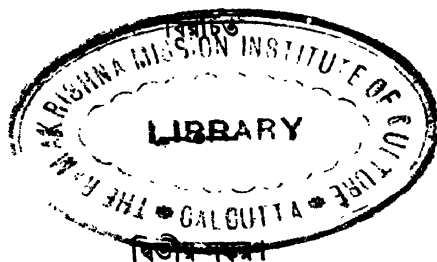
বঙ্গাব্দ ১৩২৮

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বটব্যাল

৭৭নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল পিতাঠাকুর মহাশয়, সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ রচনা করিয়া, "সাধনা" নামক মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধমালা একত্র গ্রথিত করিয়া, স্থানে স্থানে টীকা সংযোজিত করেন, এবং ভূমিকাস্বরূপ "মহর্ষি কপিলের সময়নির্ণয়" ও "বেদের সহিত কপিলের দর্শন-শাস্ত্রের সাময়িক সম্বন্ধনির্ণয়", এই দুইটি বিষয়ের নূতন রচনা করেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াই তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, আমরা তাঁহার রচিত সাংখ্য-দর্শনবিষয়ক উক্ত প্রবন্ধাবলী "সাংখ্য-দর্শন" নামে প্রচারিত করিতেছি। এই গ্রন্থে "সাধনায়" প্রকাশিত মূল প্রবন্ধগুলি এবং তাহার পরে রচিত টীকা ও ভূমিকা মুদ্রিত হইল।

দুরূহ দার্শনিক বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি যে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু এই প্রবন্ধাবলী যৎকালে "সাধনায়" প্রকাশিত হইতেছিল, তখন গ্রন্থকারের আহ্বানসত্ত্বেও কেহই প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর

হন নাই; সুতরাং পিতৃদেবের সিদ্ধান্তগুলি সর্ব্বসাধারণের অনুমোদিত কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। যখন "সাধনায়" মুদ্রিত হইবার অব্যবহিত পরেই স্বর্গীয় গ্রন্থকার তাঁহার প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন নাই, তখন এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐ প্রবন্ধগুলির কোন কোনটির পরিবর্ত্তন করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। পরিবর্ত্তন-কার্য্য আরব্ধও হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমাপ্ত হয় নাই। তিনি সাংখ্য-দর্শনের প্রচলিত গ্রন্থকারদিগের মত গ্রহণ না করিয়া, ঐ দর্শনের সূত্র ও কারিকাগুলি স্বয়ং যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহাই বিবৃত করিয়াছেন। অভিযোক্তা ব্যক্তি-দিগের মতে ঐ বিবৃতি স্থানে স্থানে প্রচলিত মতানুযায়িনী না হইলেও, উহাতে স্বর্গীয় গ্রন্থকারের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও দার্শনিক-গবেষণার পরিচয় আছে।

পূজ্যপাদ পিতৃদেবের জীবদ্দশায় তাঁহার তত্ত্বাবধারণে মুদ্রিত হইলে, "সাংখ্য-দর্শন" যেরূপ হইত, বর্ত্তমান সংস্করণ সেরূপ হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহার রচনা যেমন ছিল, আমরা অবিকল সেইরূপ মুদ্রিত করিলাম। এই "সাংখ্য-দর্শন" যদি পাঠকসমাজে পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল; ইতি।

২৬, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সন ১৩০৬ সাল, ১৩ই অগ্রহায়ণ। } শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বটব্যাল।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"সাংখ্যদর্শনের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ কয়েক বৎসর হইল নিঃশেষিত হইয়াছে কিন্তু উহার প্রকাশক আমার অগ্রজ পূজ্যপাদ স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বটব্যাল মহাশয় লোকান্তরিত হওয়ায় নানা ঝঞ্ঝাট বশতঃ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত করিবার সুযোগ হয় নাই।

সংবাদ পত্রাদিতে "সাংখ্যদর্শনের" যেরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে এবং কোন কোন মহাত্মা ইহার সম্বন্ধে অযাচিতভাবে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কয়েকখানি পুস্তকের শেষভাগে প্রকাশিত হইল। পুস্তকখানি যে বিদ্বৎসমাজে পরিগৃহীত হইয়াছে ইহা আনন্দের বিষয়। উপস্থিত কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় অত্যধিক হইলেও পাঠক সাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান সংস্করণের মূল্য পূর্ব্ববৎ ১।০ এক টাকা চারি আনাই রহিল। আশা করি প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণ-খানিও পাঠকসমাজে আদরণীয় হইবে। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সুতরাং উচ্চ পরীক্ষার্থীদিগেরও পুস্তকখানি উপকারে আসিবে এরূপ আশাও করা যাইতে পারে; ইতি।

৭৭নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১লা বৈশাখ ১৩২৮।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বটব্যাল।

মহর্ষি কপিলের সময় নির্ণয় ॥

সাংখ্যদর্শনের আদি আচার্য্য মহর্ষি কপিল বুদ্ধের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। বুদ্ধদেব কপিলবাস্তু নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন,— তাহাকেই কেহ কেহ সাংখ্যাচার্য্য কপিলের জন্মভূমি বলিয়া অনুমান করেন। সিংহলদেশীয় শ্রমণেরা যেরূপ বলেন, তাহাতে খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়েন। তৎকালে তাঁহার বয়স অশীতি বৎসর হইয়াছিল। তাহাতে $\frac{\text{শকাব্দপূর্ব্ব ৭০১—৬২১}}{\text{খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৬২৩—৫৪৩}}$ বৎসর বুদ্ধের আবির্ভাবকাল ধরিয়া, তাহার অন্যূন একশত বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ $\frac{\text{শকাব্দপূর্ব্ব ৮০১}}{\text{খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৭২৩}}$ বৎসরে মহর্ষি কপিল আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বিবেচনা হয়। ইহা অবশ্যই একটা স্থূল গণনা। কিন্তু ইহা অপেক্ষা নিশ্চিতরূপে কপিলের সময় অবধারণ করিবার এক্ষণে উপায় নাই।

কপিলই প্রথমে আত্মাকে "নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-বুদ্ধ-স্বভাব" বলিয়া খ্যাপন করেন। আত্মা আপনার স্বভাবসিদ্ধ "বুদ্ধ" বা বিশুদ্ধ চৈতন্যময় অবস্থা পুনর্লাভ করিতে পারিলেই মুক্ত হয়। অতএব কপিল-শিষ্যেরা কিরূপে "বুদ্ধ" হইতে পারা যায়, তাহারই উপায়-উদ্ভাবনে কিছু

দিন যত্ন করিয়াছিলেন। তপস্যা দ্বারা শরীরকে ক্লেশ-সহিষ্ণু করিতে পারিলে হয় ত আত্মা অবশেষে ক্লেশের পারগামী হইয়া, কেবল বিশুদ্ধচৈতন্যময় বা "বুদ্ধ" হইতে পারে মনে করিয়া, কপিল-শিষ্যেরা তপস্যা, ধ্যান, ও যোগাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন। সংসার নিতান্ত ক্লেশের স্থান, মনুষ্যাত্মা সংসারে সুখদুঃখের রজ্জুতে "বদ্ধ" হইয়া অতীব শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, চিন্তাশীল মনুষ্যের মনে তৎকালে এইরূপ সংস্কার বদ্ধ-মূল হইয়াছিল। কিরূপে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধারলাভ হইতে পারে, কপিল তাহার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কারের যত্ন করেন। সেই পন্থাকে সন্ন্যাসপন্থা বা তপস্যাপন্থা বলা যায়। সিদ্ধার্থ-গৌতম প্রথমে "বুদ্ধ" হইবার জন্য সেই পন্থারই অনুসরণ করেন; কিন্তু অব-শেষে তাহা নিষ্ফল ও ভ্রমাত্মক বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইলে, তিনি স্বীয় অভিনব পন্থা,—যাহাকে "বুদ্ধপন্থা" বলা যাইতে পারে,—প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই কথার উপর লক্ষ্য রাখিলে, কপিল ও সিদ্ধার্থ-গৌতম-বুদ্ধের মধ্যে যে অন্ততঃ এক শত বৎসর অতীত হইয়া-ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কপিলের উপদেশ তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান প্রধান স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। দেশে দেশে লোকে "বুদ্ধ" হইবার জন্য

উদ্যমশীল হইয়াছিল। যাঁহারা এইরূপে বুদ্ধ হইবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন, তাঁহারাই অবশেষে সিদ্ধার্থগৌতমের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকেই একমাত্র "বুদ্ধ" বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, তিনি "বুদ্ধদেব" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব, কপিলকে সিদ্ধার্থ-গৌতমের পূর্ব্বকালীন ব্যক্তি বলা যায়।

(ক)

ঋগ্বেদের সময়ে ঈশ্বরে পণ্ডিতদের অটল বিশ্বাস।

কপিলের সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে পণ্ডিতদের ঘোরতর সন্দেহ, এমন কি, অবিশ্বাস।

(খ)

ঋগ্বেদের সময়ে লোকের ঐহিক-উন্নতি-সাধনে অসাধারণ উৎসাহ ও প্রযত্ন। রাজ্য, ধনসমৃদ্ধি, বীরপুত্র, ইহাই লোকে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিত।

কপিলের সময়ে ঐহিক সুখে পণ্ডিতদের ঘোরতর বিরাগ।

(গ)

ঋগ্বেদের সময়ে লোকে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইবার কামনা করিত। স্বর্গ কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্থান বলিয়া মনে করিত। এবং যাগযজ্ঞকে স্বর্গলাভের উপায় মনে করিত।

কপিলের সময়ে পণ্ডিতেরা স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। স্বর্গেও দুঃখ আছে বলিয়া মনে করিতেন। অতএব যাগযজ্ঞে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বর্গ ছাড়িয়া এই সময়ে তাঁহারা মুক্তির কামনা করিতেন।

(ঘ)

ঋগ্বেদের সময়ে ব্রহ্মচর্য্য এবং গার্হস্থ্য, কেবল এই দুই

আশ্রম দেখা যায় ; কপিলের সময়ে বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু আশ্রমেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

(৬)

ঋগ্বেদের সময়ে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং ব্রাহ্মণেরা অনেকেই বিদ্বান্, গণ্যমান্য ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ-সমাজের অবস্থা এই সময়ে সকল বিষয়েই ভাল।

কপিলের সময়ে ব্রাহ্মণদের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা হীন হইয়া আসিতেছিল। অনেকে বৃত্তি-কর্ষিত হইয়াছিল। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনায় পূর্ব্বের ন্যায় সুখ ছিল না। ব্রাহ্মণ-সমাজ অনুভব করিতে-ছিল যে, সুখের সময় গিয়া দুঃখের সময় আসিয়াছে। পূর্ব্বকালকে ব্রাহ্মণেরা সত্যযুগ বলিয়া স্মরণ করিতে-ছিলেন, এবং বর্ত্তমান দুঃখের অবস্থাকে কলিযুগ বলিয়া বর্ণনা করিতেছিলেন।

(৮)

ঋগ্বেদের সময় কবিতার সমাদর ছিল। কপিলের সময় কবিতা হেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কবিতার পরিবর্ত্তে তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তার্কিকেরা এই সময়ে যাগযজ্ঞ ও বেদের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতেছিলেন।

খৃঃ পূঃ ১৫১৫ }
শঃ পূঃ ১৫৯৩ }

তদীয় পিতা তৎকালে ৩০ বৎসর বয়স্ক ধরিলে পরাশর ঋষির জন্মকাল,

খৃঃ পূঃ ১৫৪৫ }
শঃ পূঃ ১৬২৩ }

সেই হিসাবে পরাশরপিতা শক্তি ঋষির জন্মকাল,

খৃঃ পূঃ ১৫৭৫ }
শঃ পূঃ ১৬৫৩ }

শক্তির পিতা বসিষ্ঠ ঋষির জন্মকাল,

খৃঃ পূঃ ১৬০৫ }
শঃ পূঃ ১৬৮৩ }

বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সমকালীন ঋষি। তাঁহাদের সময়ে মহারাজাধিরাজ সুদাস আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাটপদে অভিষিক্ত ছিলেন। সুদাসের মহাভিষেকের অনুমানিক সময়,

খৃঃ পূঃ ১৫৫৫ } বৎসর।
শঃ পূঃ ১৬৩৩ }

এই সময়েই ঋগ্বেদ রচিত হইতেছিল। এতদ্দারা অনুমান হয়, বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রায় ৮৮০ বৎসর পরে কপিলের জন্ম ও আবির্ভাব হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতসমাজে যে সকল মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা ঋগ্বেদ ও কপিল-দর্শন-পাঠে অবগত হওয়া যায়। সংক্ষেপে তাহা এই,—

বেদের সহিত কপিলের দর্শন-শাস্ত্রের সাময়িক সম্বন্ধ নির্ণয়।

বিষ্ণুপুরাণের ঐতিহাসিক বিবরণে জানা যায় যে, নন্দাভিষেকের ১০১৫ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। [প্রাচীন পণ্ডিতেরা পরীক্ষিতের সময় হইতেই কলিকালের আরম্ভ বলিয়া বিবেচনা করিতেন; এবং নন্দাভিষেকের সময় কলির মধ্যাহ্ন বা বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতেন। নন্দের ১০০ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন; এবং ইংরাজ পণ্ডিতদের গবেষণায় নির্ণীত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ অব্দে, শকাব্দপূর্ব্ব ৪০৩ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হয়েন। তদনুসারে,—

নন্দাভিষেকের সময়	খৃঃ পূঃ ৪২৫ শঃ পূঃ ৫০৩
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বা পরীক্ষিতের জন্মের সময়	খৃঃ পূঃ ১৪৪০ শঃ পূঃ ১৫১৮

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে পরিণতবয়স্ক, অর্থাৎ ৭৫ বৎসর বয়স্ক অনুমান করিলে, তাঁহার জন্মকাল,—

সূচীপত্র

সাংখ্য-দর্শন

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে সাংখ্যের ন্যায় গভীর যুক্তিপূর্ণ মূলতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিচার অন্য কোন দর্শনশাস্ত্রে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাংখ্যের প্রকৃত মত বুঝেন, বা বুঝাইতে পারেন, এরূপ পণ্ডিত বিরল। বেদান্তের সহিত সাংখ্যের যে বিরোধ, তাহা সামঞ্জস্যের অতীত; যিনি বেদান্তের মতে মত দিবেন, তিনি সাংখ্যের মতে মত দিতে পারেন না; এবং যিনি সাংখ্যের মতে মত দিবেন, তিনি বেদান্তের মতে মত দিতে পারেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—উভয় মতের বিরোধ না বুঝিয়া অনেকে তাহার সামঞ্জস্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; অনেকে যুগপৎ

সাংখ্য ও বৈদান্তিক হইয়া পড়েন। অনেক বড় বড় পণ্ডিতকে বলিতে শুনা যায়, সাংখ্যও ঠিক, বেদান্তও ঠিক ; তাহা যে অসম্ভব, তাহা তাহারা পরিগ্রহ করিতে পারেন না। ভগবদগীতা ও বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় গ্রন্থ সাংখ্যের মত অনুসরণ করে কি বেদান্তের মত অনুসরণ করে, অনেক সময়ে নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু দেখা যায়, যাঁহারা বেদান্তের বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহারাও সাংখ্যের পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে সাংখ্য-পরিভাষার উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। সাংখ্যের মর্য্যাদার বিষয় অধিক আর কি বলিব, ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে যে, সপ্তর্ষি কর্ত্তৃক ভূমণ্ডলে বেদ প্রচারের পূর্ব্বে অগ্রে সাংখ্যদর্শন প্রকাশিত হইয়াছিল। পুরাণকর্ত্তার চক্ষে সাংখ্যদর্শন বেদের অপেক্ষা অধিক না হউক বেদের তুল্য সম্মানের সামগ্রী। এক্ষণে আমরা এই সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্বগুলির সমালোচনায় ব্যাপৃত হইব।

১॥ বেদ ও দর্শন

"ধর্ম্ম" ও "ব্রহ্ম" বেদের বিষয়। "ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদধর্ম্মেণ"—অর্থাৎ ইহলোকে ধর্ম্ম আচরণ করিলে পরলোকে সদ্‌গতি, এবং অধর্ম্ম আচরণ করিলে পরলোকে অধোগতি হইবে, এই তত্ত্ব বেদের বিষয়। এই বিশ্বসংসার একজন সচ্চিদানন্দময় বিধাতাপুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, এবং পরিরক্ষিত হইতেছে, এই তত্ত্বও বেদের বিষয়। কিন্তু এই সকল তত্ত্ব "দর্শন"-শাস্ত্রসম্মত প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় না; তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে—"ধর্ম্মব্রহ্মণী বেদৈকবেদ্যে ইতি"। দর্শনশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে "দর্শন" এবং দর্শনমূলক অনুমানের উপরে সংগঠিত; আর বেদের তত্ত্ব ও বিষয় "অদৃষ্ট", অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের অতীত। যাঁহারা অস্মদ্দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলপত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা মানববুদ্ধিগম্য সত্যসকলকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—একশ্রেণী "দৃষ্ট"—আর এক শ্রেণী "অদৃষ্ট"। যে সকল সত্য "অদৃষ্ট", তাহা বেদের দ্বারা

অবগত হওয়া যায়; দর্শনশাস্ত্র কেবল "দৃষ্ট" সত্য লইয়াই ব্যাপৃত।

অতএব দর্শন ও বেদশাস্ত্রের বিষয় একটি পরিষ্কার সীমাচিহ্নে চিহ্নিত। আমরা অনেক সময়ে এই সীমাচিহ্ন ভুলিয়া যাই। অনেক সময়ে ব্রহ্ম ও ধর্ম্মের অলৌকিক অদৃষ্টতত্ত্ব যাহা দর্শনশাস্ত্রের সীমার সম্পূর্ণ বহির্ভূত, তাহাকে দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভূত করিতে চেষ্টা করি; তাহাতে সত্যের আবিষ্কার না হইয়া আত্মা সংশয়ের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হয় মাত্র।

সাংখ্যেরা ত্রিবিধ প্রমাণ অঙ্গীকার করেন; যথা,— প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন। আপ্তবচন অর্থাৎ বেদ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৃতীয়বিধ প্রমাণ (আপ্তবচন) দর্শনশাস্ত্রীয় প্রমাণ নহে। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী সাংখ্য, তাঁহারা বলেন, বেদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই; বেদ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের শিক্ষা দেয়, আমরা কেবল ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়েরই আলোচনা করি। কিন্তু কোনও কোনও সাংখ্য পণ্ডিত আপনাদের মতকে বেদসম্মত ও বেদাবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছেন। তাহা ভিন্ন কথা। আমরা বিবেচনা করি, এরূপ যত্ন ভ্রমাত্মক।

বেদের সহিত দর্শনের বিরোধ সম্ভবে না। বেদ যদি দর্শনের সীমায় পদার্পণ করেন, সে অনধিকারচর্চ্চা। দর্শনও যদি বেদের সীমায় যাইতে চাহেন, তাহাও অনধিকারচর্চ্চা। বেদ ও দর্শনের আলোচনায় ব্যাপৃত হইলে এই কথাটি সম্পূর্ণরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। দর্শন এবং দর্শনমূলক অনুমানই দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি। বেদান্তদর্শনের মত বেদসম্মত, আর সাংখ্যদর্শনের মত বেদসম্মত নহে, এই কথাটি প্রমাণ করার জন্য শঙ্করাচার্য্য অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন ; সে সমুদায় যত্ন এবং পরিশ্রমই ভস্মাহুতি হইয়াছে। দর্শন ও দর্শনমূলক অনুমান কোন্ মতের পোষকতা করে, ইহাই সম্পূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

---

২ ॥ নিত্য বস্তু ॥

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল পদার্থ দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, দেখিতে পাই, তাহারা ঘোরতর পরিবর্ত্তনের অধীন। শুদ্ধ পরিবর্ত্তন কেন, আপাততঃ অনেক নূতন পদার্থের উৎপত্তি, অনেক বর্ত্তমান পদার্থের ধ্বংসও লক্ষিত হয়। আমরা নিজে জন্ম-মৃত্যুর অধীন। যতদূর দেখা যায়, তাহাতে জন্মের পূর্ব্বে কোন অস্তিত্বই ছিল না—মৃত্যুর পরও কোন অস্তিত্ব থাকে না। তাহাতে কোন কোন দার্শনিক স্থির করিলেন, আমরা "অনিত্য" পদার্থ। অন্ততঃ আমাদের দেহ "অনিত্য" পদার্থ। ইহা আজ আছে, কাল নাই।

তাহার উত্তরে অপর দার্শনিক বলিলেন, দেখ তোমার দেহ অনিত্য কিরূপে? তোমার দেহ ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি যে উপাদানে গঠিত, তাহার ত' ধ্বংস দেখি না। তোমার দেহ ধ্বংস না হইয়া কেবল রূপান্তর হয় মাত্র। পঞ্চভূতকে তুমি অনিত্য বলিতে পার না।

প্রত্যুত্তরে অনিত্যবাদী বলিলেন, পঞ্চভূতই বা নিত্য কি প্রকারে? ইহাকে আমি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের বিকারমাত্র বলি। পঞ্চভূতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ভিন্ন আর কি আছে? কিছুই নাই। আর রূপরসাদি আমাদের মনের জ্ঞানমাত্র। দেখ দর্পণে তুমি আপন প্রতিবিম্ব দেখিবে, তাহাতে রূপ আছে—তাহা কি অলীক নয়? তাহা কি তোমার জ্ঞানমাত্র নয়? দেখ স্বপ্নে তুমি কত প্রকার রূপরসাদির সংঘস্বরূপ পদার্থের উপলব্ধি কর, তাহারাও কি অলীক নয়? তাহারাও কি তোমার জ্ঞানমাত্র নয়? আরও দেখ জাগ্রৎ অবস্থায় তুমি কিরূপ প্রত্যক্ষ কর। তুমি সূর্য্য দেখিতেছ; যেন একটি থালার মত। প্রাতঃকালে লোহিতবর্ণ, আবার মধ্যাহ্নে পীতবর্ণ। উপরিভাগ যেন সমতল। কিন্তু তুমি জ্যোতিষের অনুমানে জানিতে পার, সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়—ইহা বর্ত্তুলাকার। যে পদার্থ একবার লাল একবার হলুদে দেখায়, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, তাহা লালও নয়, হলুদেও নয়। লোহিতাদি বর্ণজ্ঞান তোমার জ্ঞান বই আর কিছুই নয়। অতএব যে সংসারে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ভিন্ন আর কিছুই দেখি না, তাহা কেবল আমাদের

জ্ঞানের খেলা। আমরা জাগিয়া জাগিয়া একপ্রকার স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। সংসারে জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই। (১) আর জ্ঞান ক্ষণিক। চক্ষু চাহিলাম ত নানাবিধ বর্ণ দেখিলাম, চক্ষু মুদিলাম ত সব অন্তর্ধান! এই হইতেছে, এই গেল, ইহাই জ্ঞানের আকার ও প্রকৃতি। অতএব

---

(১) জ্ঞানবৈচিত্র্যই সংসার; ঐ জ্ঞানবৈচিত্র্যকে চাক্ষুষাদি ভেদে নিম্নলিখিত রূপে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা ;—

১। চাক্ষুষ জ্ঞান। (ক) লোহিত ইত্যাদি বর্ণজ্ঞান।

(খ) আকাশজ্ঞান—যথা দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ ত্রিকোণ বৃত্ত প্রভৃতি আকার,—সান্নিধ্য বা দূরত্ব—এক দুই ইত্যাদি সংখ্যা (?) ছোট বড় ইত্যাদি পরিমাণ (গ) পারম্পর্য্য বা কালজ্ঞান।

২। শ্রাবণ জ্ঞান—শব্দ। কাল। সংখ্যা।

৩। ঘ্রাণ জ্ঞান—গন্ধ। কাল।

৪। ত্বাচ জ্ঞান—স্পর্শ।

৫। রাসন জ্ঞান—রস।

৬। মাংসিক জ্ঞান—কাঠিন্য কোমলতা, স্থিতি গতি। অবরোধ।

৭। মানসিক জ্ঞান—স্মৃতি, চিন্তা, ইচ্ছা, ভয়, আশা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি।

৮। বিনয় জ্ঞান—ভাল মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম।

সমগ্র সংসার অলীক ও ক্ষণিক। সংক্ষেপে এই তত্ত্ব এইরূপে প্রকাশিত "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং"। তুমি যে কিছু পদার্থ আছে বলিয়া বল, তাহা কেবল জ্ঞানের বিকার ও ক্ষণিক।

ইহার প্রত্যুত্তরে নিত্যপদার্থবাদী বলেন, বেশ, সমুদায় বাহ্য বস্তু তর্কানুরোধে জ্ঞানের বিকার বলিয়া স্বীকার করিলাম, কিন্তু জ্ঞানের আধারস্বরূপ অহংপ্রত্যয়মূলক আত্মার কথা কি? ইহা ত নিত্য বটে? তুমি আত্মাকে ক্ষণিক বলিতে পার না। যে আমি কল্য ছিলাম, সে আমি অদ্য রহিয়াছি বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে।

তাহাতে অনিত্যবাদী বলেন, অহংপ্রত্যয়ও একপ্রকার জ্ঞানমাত্র এবং অন্যান্য জ্ঞানের ন্যায় অলীক; তবে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের স্মৃতি আছে, অবশ্য স্বীকার করি। কিন্তু ইহাকে আমরা জ্ঞানের ধারাবাহিকতা বলি। জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে ক্ষণিক, কিন্তু ইহা স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন। একটি অনিত্য জ্ঞান উদয় হইয়া অস্তমিত না হইতে হইতে অপর একটি উদয় হয়। আর ভূরি ভূরি ক্ষণিক জ্ঞান যুগপৎ উদয় হয়। অবিচ্ছেদে এইরূপ জ্ঞানরাশি জন্মিয়া একটি জ্ঞান অপর জ্ঞানকে এইরূপে অভিভূত করে যে,

তাহাতে "অহং" এইরূপ আর একটি মিশ্র ক্ষণিক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। বস্তুগত্যা, আত্মা নামে কোন নিত্য পদার্থের সত্তার কোন প্রমাণ দেখি না।

ইহার নাম বিশুদ্ধ নাস্তিবাদ। ইহা বৈদিক নাস্তিকতা নহে, দার্শনিক নাস্তিকতা। যোগাচার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা এই মতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। (২)

নিত্যপদার্থ এই পৃথিবীতে দর্শনশাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে আছে কি নাই—এইটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদের স্থান। কেহ বলেন, আছে—কেহ বলেন, নাই। ইঁহাদের মধ্যে বিবাদের সামঞ্জস্য অসম্ভব—"আছে" ও "নাই" ইহার মধ্যে অপর কোন কোটি নাই। হয় আছি, না হয় নাই।

(২) বিষ্ণুপুরাণে বুদ্ধকে "মায়ামোহ" নাম দিয়া তাঁহার উপদেশ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

"বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ।
"বুদ্ধধ্বং মে বচঃ সম্যগ্বুধৈরেবমুদীরিতম্॥
"জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিজ্ঞানার্থতৎপরং।"—
৩য় অংশ। ১৮শ অধ্যায়।

সাংখ্যেরা ইহার প্রতিবাদ করেন।

এতদ্দ্বারা দার্শনিক সম্প্রদায়কে এইরূপে বিভক্ত করা যায় ; যথা—
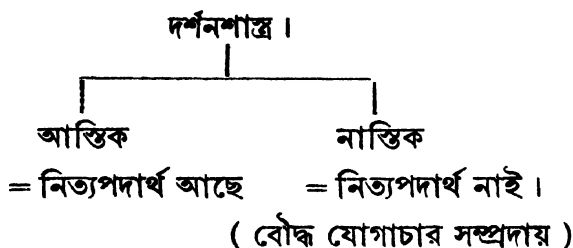
প্রথমতঃ বিবেচ্য, সাংখ্যদর্শন এই দুইয়ের কোন্ শাখার অন্তর্গত। সাংখ্যেরা নিত্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অতএব তাঁহারা আস্তিক শাখার অন্তর্গত।

বেদান্তদর্শনেও নিত্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে। ইহাও আস্তিক শাখার অন্তর্গত। নাস্তিকের সহিত বিবাদে সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েই এক দিকে, তখন তাহারা মিত্র। কিন্তু এই উভয় মিত্রের মধ্যে আর একটি নূতন বিবাদ।

স্বীকার করিলাম নিত্য পদার্থ আছে—কিন্তু জ্ঞানের আধারস্বরূপ যে আত্মা তদ্ভিন্ন আর কিছু নিত্য পদার্থ আছে কি না ? বেদান্তদার্শনিক নাস্তিকদের সঙ্গে বলেন

যে, জড়জগতে রূপরসাদি জ্ঞানের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নাই—জড়জগতের সকলই অনিত্য। তবে অধ্যাত্মজগতে জ্ঞান ও জ্ঞানের ধারাবাহিকতা ভিন্ন যে আর কিছুই নাই, এ কথা স্বীকার করি না। "আত্মা" নামক কূটস্থ নিত্যপদার্থকে আমরা সর্ব্বদাই উপলব্ধি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি—এই আত্মাকে কেবল জ্ঞান নহে, সুখদুঃখ ও নানাবিধ প্রবৃত্তির আধারস্বরূপ দেখিতেছি। অতএব অধ্যাত্মজগতে নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করি। নিশ্চয়ই যে আমি কল্য ছিলাম, সেই আমি "সোঽহং" অদ্য রহিয়াছি—ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আমি নিত্য। কেবল আমিই নিত্য—আর সব অনিত্য।

বেদান্তদর্শনের "সোঽহং" এই সূত্রে পরে ভিন্নার্থের যোজনা করা হইয়াছে; কিন্তু মূলে "সোঽহং" এই সূত্র আত্মার নিত্যত্ব-প্রতিপাদক। সাংখ্যেরাও বেদান্তবাদীদের ন্যায় আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করেন —কিন্তু তাঁহারা আত্মা ভিন্ন আর যে নিত্যপদার্থ নাই এ কথা স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে বেদান্তে আত্মাকে একজাতীয় পদার্থ না বলিয়া একমাত্র (এক-

মেবাদ্বিতীয়ং) পদার্থ বলা হয়। এটি যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরপ্রতিপাদনের ফন্দী। যখন নাস্তিকেরা নিত্য পদার্থ নাই, অতএব ঈশ্বর নাই—এইরূপ ঘোষণা করিলেন, তখন বৈদান্তিকেরা আত্মা নামক নিত্যপদার্থ আছে এবং অত্মাই ঈশ্বর—এইরূপ প্রতিঘোষণা উত্থাপন করিলেন। নাস্তিকেরা বলেন, জ্ঞান হইতে জগতের সৃষ্টি, বৈদান্তিকেরা বলেন, না, জ্ঞানের আধার যে আত্মা তাহারই ক্রিয়া দ্বারা জগতের সৃষ্টি। যে পদার্থ-সংঘকে আমি জগৎ বলি, তাহা আমারই আত্মা সৃষ্টি করিয়াছে; যে পদার্থসংঘকে তুমি জগৎ বল, তোমার আত্মা তাহা সৃষ্টি করিয়াছে। তোমার জগতে এবং আমার জগতে কোনও প্রভেদ নাই দেখিতেছি; অতএব তোমার আত্মা ও আমার আত্মাতেও ভেদ নাই। জগতে আত্মা নামক একমাত্র নিত্য পদার্থ আছে, আর কিছুই নাই—তাহাই এই জগৎসংসার সৃষ্টি করিয়াছে—"আত্মা বৈ ইদম্ একম্ অগ্রে আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বম্ অসৃজৎ"। এই হইল বেদান্তমত।

সাংখ্য বলেন, সে কি?—তোমাতে আমাতে ভেদ

প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সে কেমন ধারা যুক্তি যাহাতে প্রত্যক্ষ-দর্শনকে অলীক বলিয়া প্রতিপাদন করে? বেদান্তবাদী বলেন, ভাই, তুমি যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ কর, তাহা মায়াময়,—সূক্তিতে রজতজ্ঞানের ন্যায়, রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায় অলীক। সকল স্থলেই যে প্রত্যক্ষদর্শন ঠিক, তাহা নহে; যুক্তিতে যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষবিসম্বাদী হইলেও গ্রাহ্য। সাংখ্য বলেন, তোমার যুক্তিও দূষণীয়। তোমার জগৎ ও আমার জগৎ তুল্য নানা কারণে হইতে পারে, ইহাতে তোমার ও আমার আত্মার একত্ব মানিতে গেলাম কেন? এই তর্কে নিত্যবস্তু এক বটে বা বহু বটে, এই বিষয় লইয়া সাংখ্য ও বেদান্তে বিবাদ। বেদান্ত বলেন, নিত্য বস্তু এক—"একমেবাদ্বিতীয়ং"। সাংখ্য বলেন, নিত্য বস্তু অনেক। অনেক বলিলেই কি কি ও কতগুলি তাহা বলিতে হয়, তাই পরক্ষণেই সাংখ্যেরা নিত্য বস্তুর একটী তালিকা দিয়া "সংখ্যা" নির্ণয় করেন। নিত্য বস্তুর "সংখ্যা" করেন বলিয়া ইঁহাদের নাম "সাংখ্য"।

এক্ষণে দর্শনশাস্ত্রকে এইরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা—

দর্শনশাস্ত্র।
আস্তিক
নাস্তিক
নিত্যবস্তু নাই।
সাংখ্য
বেদান্ত
নিত্য বস্তু অনেক।
নিত্য বস্তু এক।
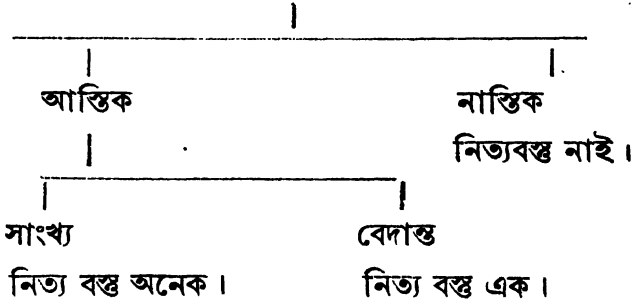
৩॥ পদার্থের ত্রৈবিধ্য ॥

বাল্যকালে বোধোদয়ের সময় পূজ্যপাদ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় শিখাইয়াছিলেন, "পদার্থ" তিন প্রকার—চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্। পাঠকবৃন্দ এই সংস্কার ত্যাগ করিবেন। দর্শনশাস্ত্রের পদার্থ ভিন্ন সামগ্রী। পদ+অর্থ=পদার্থ। পদের অর্থাৎ বাক্যের অর্থ দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহার নাম "পদার্থ"। ইংরাজীতে ইহাকে categories of thought বলে। দর্শনশাস্ত্রে পদার্থের লক্ষণ এই, "বাচ্যং জ্ঞেয়ং"। যাহা বাচ্য, তাহা জ্ঞেয়। যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগম্য, জ্ঞানের আকারে আকারিত হইলে যাহা বাক্যের আকারে প্রকাশিত হয়, তাহার নাম পদার্থ। স্বপ্ন একপ্রকার পদার্থ, কল্পনা একপ্রকার পদার্থ, অভাব একপ্রকার পদার্থ। ফলতঃ, সাধারণ পাঠকে "দ্রব্য" ও "পদার্থে"র ভেদ বুঝে না। দ্রব্য একপ্রার পদার্থ। কিন্তু পদার্থ বলিলে দ্রব্য ভিন্ন আরো অনেক সামগ্রী বুঝায়।

আমরা যাহা কিছু মনে মনে চিন্তা করিতে

পারি ও কথা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি, তৎসমুদায়ই পদার্থ। পদার্থের এইরূপ লক্ষণ নিশ্চয় করিয়া পণ্ডিতেরা পদার্থ কয় প্রকার তাহার নানা প্রকার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গোতমের ন্যায়শাস্ত্রের অনেক পদার্থ উড়াইয়া দিয়া বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ সপ্ত প্রকার এইরূপ নিশ্চিত হইয়াছিল ; তাহা এই—

১ দ্রব্য ; ২ গুণ ; ৩ কর্ম্ম ; ৪ জাতি ; ৫ বিশেষ ; ৬ সমবায়সম্বন্ধ ; এবং ৭ অভাব। পরে আবার দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করিয়া বৈশেষিকেরা বলেন, দ্রব্য নানা শ্রেণীর, যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক, আত্মা ইত্যাদি।

এই মতে ক্ষিতি প্রভৃতি ভূত এবং আত্মা, দ্রব্য নামক পদার্থের অন্তর্গত। ইহাতে ভৌতিক দ্রব্য এবং আত্মাকে, একই শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিয়া উভয়ের প্রকৃতিগত একটি মৌলিক বৈষম্যকে উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং ক্ষিত্যাদি ভূতের প্রকৃত ও প্রতীয়মান সত্তার কোন আভাস নাই।

সাংখ্যেরা পদার্থের অন্য প্রকার একটি সুন্দর শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন. তাঁহাদের মতে সমুদায় পদার্থ এই তিন শ্রেণীতে বিভাজ্য, যথা—

১। ব্যক্ত।

২। অব্যক্ত।

৩। জ্ঞ।

তাঁহাদের মত এই যে, এই তিন পদার্থের "বিজ্ঞান" (৩) অর্থাৎ পার্থক্য জ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত।

কি নাস্তিক, কি বেদান্তী, কি সাংখ্য, সকলেই ঐকমত্যে স্বীকার করেন যে, সচরাচর আমরা যাহাকে বাহ্য বা জড় জগৎ বলি, তাহা রূপরসাদি জ্ঞানের বিকারমাত্র। তাহা আমাদের জ্ঞানের খেলা। তাহা অলীক। তাহা ক্ষণিক। ক্ষণে ক্ষণে তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব। তাহা ভোজবাজীর ন্যায়। বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, সূর্য্যচন্দ্র, ঘরদ্বার পুত্রকন্যা—যাহা রূপরসাদির

(৩) জ্ঞানমাত্রেরই মূলে "বিবেক" নামক পদার্থ। "বিবেক" অর্থাৎ ভেদজ্ঞান। সকল জ্ঞানেরই মূলে এই ভেদজ্ঞান দেখিতে পাইবে। বিবেক বা ভেদজ্ঞানকেই জ্ঞানের চরম আকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

তাহাতে দেখা যায় যে সংসারে, যদি "সংখ্যা" না থাকিত, অর্থাৎ সংসারে যদি এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানই অসম্ভব হইত।

আকারে আকারিত, তাহা স্বপ্নেও প্রত্যক্ষ করা যায়, চক্ষু বুজিয়াও মনে মনে স্মরণ করা যায়, অতএব তাহাদের অস্তিত্ব কেবল মনের ভিতর। মনের বাহিরে এই সংসারের কোন অস্তিত্বই নাই। তাই সূর্য্যকে থালার মত দেখায়, তাই রোগে সহজ বস্তুকে পীত দেখায়, মনের অবস্থা অনুসারে এই জগতের রূপান্তর হয়। এই অলীক ভোজবাজীর ন্যায় জ্ঞানের খেলাময় জ্ঞানরচিত ইন্দ্রিয়গোচর সংসারকে সাংখ্যেরা "ব্যক্ত" জগৎ বলেন। ইহাই প্রথম শ্রেণীর পদার্থ।

আমরা জ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছিয়া দেখিতে পাই যে, তথায় দুইটী পদার্থের বিবেক সিদ্ধ হইতেছে,—একটির নাম "জ্ঞ", অপরটির নাম "জ্ঞেয়"; জ্ঞ-জ্ঞেয়ের বিবেক বা পার্থক্য প্রতীতিরই নামান্তর জ্ঞান। এই পার্থক্য অতিক্রম করা কল্পনারও অসাধ্য। জ্ঞ ও জ্ঞেয়ের অভেদ প্রতীতি একেবারেই অসম্ভব।

প্রথমত জ্ঞ-জ্ঞেয়ের "বিবেক'—তাহার পর বহুসংখ্যক জ্ঞেয়ের মধ্যে পরস্পর "বিবেক"—এইরূপে উত্তরোত্তর বিবেক-স্ফূর্ত্তির নামই জ্ঞানোদয়।

অতএব যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত। দ্বৈতভাবই জ্ঞানের বিষয়; দ্বৈত ব্যতিরেকে জ্ঞানই অসম্ভব। জ্ঞান যদি সত্য হয়, তবে পদার্থ "একমেবদ্বিতীয়ং" নহে, তাহা অনেক।

বিবেকের আকার দ্বিবিধ—যৌগপদ্যে বিবেক, পারম্পর্য্যে বিবেক, পারম্পর্য্য বিবেকের সাধারণ নাম "কাল"; যৌগপদ্য

কিন্তু নাস্তিক ও বেদান্তীদের সহিত বিবাদ করিয়া সাংখ্যেরা আরো বলেন যে, এই ব্যক্তের পশ্চদ্‌ভাগে এক অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত জগৎ বিদ্যমান আছে। সূর্য্য দুই প্রকার, ব্যক্ত সূর্য্য, যাহা পৃথিবী অপেক্ষা অনেক প্রকাণ্ড হইয়াও সামান্য থালার মত দেখায়, যাহাকে অবস্থাভেদে কখনও লোহিত কখনও পীত বলিয়া মনে হয়, যাহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ না করিলেও ঐরূপে ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া মনে হয়; আর অব্যক্ত সূর্য্য যাহা আমাদের মনে ঐরূপ জ্ঞান-উৎপত্তির প্রতি কারণস্বরূপ। এইরূপে সমুদায় "জড়" পদার্থকেই "ব্যক্ত" বা "অব্যক্ত" বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। যে

বিবেকের সাধারণ নাম "বিশেষ"। যখন যুগপৎ সেতার ও বংশীধ্বনি শুনা যায়, তখন উভয়ের ভেদজ্ঞানকে "বিশেষ" এই পারিভাষিক নাম দেওয়া যায়। যখন সর্ব্বাংশে সমান দুইটি ধূলিকণার বিবেক প্রতীতি হয়, সেই ভেদজ্ঞানকেও "বিশেষ" পারিভাষিক নাম দেওয়া যায়।

জ্ঞ এবং জ্ঞেয়ের নিরন্তরই যৌগপদ্যে বিবেক জ্ঞান হইয়া থাকে; অতএব জ্ঞ এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই "বিশেষ" নামক ভেদজ্ঞান বিদ্যমান।

জ্ঞেয় পদার্থের সাধারণ নাম "ব্যক্ত"। ব্যক্ত দ্বিবিধ; বিশুদ্ধ ব্যক্ত বা তন্মাত্র-প্রপঞ্চীকৃত ব্যক্ত বা ভূত।

জড়পদার্থ জ্ঞানের বহির্ভাগে থাকিয়া জ্ঞানের কারণ-স্বরূপ, যাহা জ্ঞানের আকারে আকারিত না হইলেও জ্ঞানের দ্বারা আপন অস্তিত্ব খ্যাপন করে—যাহা অতীন্দ্রিয়, তাহার নাম "অব্যক্ত"। এই অব্যক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ; ব্যক্ত ক্ষণিক ও অলীক ও জ্ঞানের অন্তর্গত পদার্থ। অব্যক্ত নিত্যস্থায়ী এবং জ্ঞানে অপ্রকাশিত।

এই অব্যক্তের অপর নাম "প্রকৃতি" বা "মূল-প্রকৃতি" বা "প্রধান"।

যদি সংসারে কেবল "অব্যক্ত" পদার্থই থাকিত, তাহা হইলে "ব্যক্তের" উৎপত্তি হইত না। যদি অব্যক্তকে দেখিবার, শুনিবার ও অনুভব করিবার কোন পদার্থান্তর না থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানই অসম্ভব হইত। জ্ঞানের বিকার ব্যক্ত জগৎ কোথা হইতে হইবে? অব্যক্ত অচেতন; যদি অব্যক্ত ভিন্ন আর কিছু সংসারে না থাকিত, তাহা হইলে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি এ সংসারে হইত না। জ্ঞান ও চৈতন্যের সত্তাবশতঃ "জ্ঞ" নামক চেতন পদার্থের অস্তিত্ব মানিতে হয়। তাহা যে কেবল অনুমানসাপেক্ষ তাহা নহে, প্রত্যেক জ্ঞানের ক্রিয়াতে "জ্ঞ" পদার্থকে আমরা সাক্ষাৎ-

কার করিতেছি। বেদান্তীরা যাহাকে আত্মা বলেন, ইহাই সাংখ্যদের "জ্ঞ"। ইহার অপর নাম "পুরুষ"। ইহা নিত্য ও চৈতন্যময়। প্রকৃতি ও পুরুষকে আমরা একটি আশ্চর্য্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত দেখিতে পাই; তাহারই ফল "ব্যক্ত" সংসার। পুরুষের যে জ্ঞান, তাহা প্রায় সম্পূর্ণ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধজনিত। এই জ্ঞানের ফলে সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি। পক্ষান্তরে ঐ সম্বন্ধের ফলে আত্মার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ এবং তদ্দ্বারা প্রকৃতিকে চালিত হইতে দেখা যায়। উভয়েই উভয়ের উপর ক্রিয়া উৎপাদন করিতেছে। (অতএব সাংখ্যেরা বলেন, পদার্থ ত্রিবিধ; ব্যক্ত, অব্যক্ত, এবং জ্ঞ। অব্যক্ত এবং জ্ঞ পরস্পর সংযুক্ত হওয়াতে ব্যক্তের সৃষ্টি বা আবির্ভাব হয়। এই সংযোগ কিরূপে সংসাধিত হয়, তাহা দর্শনশাস্ত্র জানে না—তাহা "অদৃষ্ট"। বেদে বলে, এই সংযোগ ঈশ্বরের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে, কিন্তু দর্শনশাস্ত্র তাহার কিছুই অবগত নহে। এই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগবশতঃ সংসার উৎপন্ন হয়। কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহাও সাংখ্যেরা বিচার করিয়াছেন। পরে তাহা আলোচিত হইতেছে।

---

৪ ॥ সাংখ্য, বৈদান্তিক ও লৌকিক আত্মা ॥

সাধারণ লোকে আত্মাকে কিরূপ বলিয়া জানে, তাহা নিরাকরণ করা নিতান্ত সহজ নহে। দেহ ছাড়িয়া দিলে আত্মার কি থাকে ?—সচরাচর দেখা যায়, জীবন্ত ও মৃত দেহের একটি প্রধান ভেদ আছে ; মৃত দেহে জ্ঞান নাই, জীবন্ত দেহে তাহা আছে। অতএব যদি দেহ ছাড়িয়া আত্মা আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে আত্মা এইরূপ এক পদার্থ, যাহার জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই যুক্তির অনুসরণ করিলে আত্মার আরও কতকগুলি ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত দেহের যেমন জ্ঞান নাই, তেমনি সুখ-দুঃখের অনুভব নাই, ইচ্ছাশক্তি নাই, কোন প্রকার অভিলাষ, আশা ভরসা, ভয় ক্রোধ, অনুরাগ কারুণ্যাদি প্রবৃত্তিও নাই ; কিন্তু জীবন্ত দেহে তৎসমুদায়ই আছে ; এই সকল পদার্থকে যদি দেহের ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার না করা যায়, তবে তাহারা আত্মার ধর্ম্ম হয়। অতএব সাধারণ বিবেচনায় এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞান সুখ দুঃখ ইচ্ছা কামনা আশা অভিমান ভয়ক্রোধাদি প্রবৃত্তি-নিচয়—এই সকল আধেয়ের আধারস্বরূপ, অথবা এই

সকল ধর্ম্মযুক্ত যে পদার্থ, তাহারই নাম আত্মা। এই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, কেন না মৃত দেহে তাহার অভাব ; অথচ এই আত্মা দেহের সীমায় সীমাবদ্ধ। ইহা দেহকে ব্যাপিয়া আছে, অথবা দেহের মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত আছে, কিন্তু দেহের বাহিরে ইহার সত্তা নাই। দেহ আত্মার আবরণস্বরূপ। এই আবরণে আচ্ছাদিত না হইলে আত্মার জ্ঞানাদির স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং অন্য কোন পদার্থ ইহাকে অভিভূত করিতে পারে না। দেহই আত্মার ইন্দ্রিয়, দেহই আত্মার বিহারস্থান। এইরূপ এক একটি দেহে আবদ্ধ অসংখ্য আত্মা পৃথিবীতে লীলাখেলায় ব্যাপৃত রহিয়াছে।

মোটামুটি ইহাই লৌকিক বিবেচনাসঙ্গত আত্মার বিবরণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এক্ষণে দার্শনিক পণ্ডিত অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বপক্ষ করেন,—দেহের মধ্যে আত্মা, না আত্মার মধ্যে দেহ ? কথাটি বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়। হঠাৎ শুনিলে প্রশ্নটি বিস্ময়কর বোধ হয়। আত্মা দেহের মধ্যগত না হইয়া দেহ যে আত্মার মধ্যগত হইতে পারে, ইহা ত অনেকের স্বপ্নের অগোচর। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, যদি আত্মা

নামক দেহভিন্ন কোনও পদার্থ থাকে, তবে তাহা দৈর্ঘ্য-বিস্তারবিশিষ্ট সীমাবদ্ধ কোন পদার্থের অন্তর্গত হইতে পারে না। কেন না তাহা হইলে আত্মাও দৈর্ঘ্যবিস্তার-বিশিষ্ট হয়। সেই দৈর্ঘ্যবিস্তার সূক্ষ্ম হউক বা স্থূল হউক, বালুকণার লক্ষাংশের একাংশস্বরূপ হউক, অথবা কমলা-নেবুর মত পরিমাণ-বিশিষ্টই হউক, তাহাতে আসিয়া যায় না—তাহার প্রত্যক্ষযোগ্য অথবা অনুমেয় দৈর্ঘ্য বিস্তার অঙ্গীকার করিতেই হইবে। স্মুতরাং দেহের মধ্যবর্ত্তী হইলে আত্মা দেহের একটি অংশমাত্র ; দেহ হইতে তাহাকে অভিন্ন বলা যায় না। অতএব দেহ ভিন্ন যদি কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ আত্মা নামক থাকে—তাহা কদাচ দেহের অন্তর্গত হইতে পারে না।

সাংখ্য ও বেদান্তী উভয়েই বলেন, আত্মা দেহের মধ্যে নয়, দেহই আত্মার মধ্যে। বেদান্তী আরো বলেন, "সর্ব্বম্ আত্মন্যবস্থিতম্"—শুদ্ধ দেহ কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আত্মার মধ্যে অবস্থিত! এ স্থলে সাংখ্যের সহিত বেদান্তের বিবাদ ; সাংখ্য বলেন, "ব্যক্ত" দেহ আত্মার মধ্যে বটে, "অব্যক্ত" দেহ আত্মার মধ্যে নয়। "ব্যক্ত" ব্রহ্মাণ্ড আত্মার মধ্যে বটে, কিন্তু "অব্যক্ত" ব্রহ্মাণ্ড আত্মার মধ্যে নয়।

তবে কিরূপে সর্ব্বম্ আত্মন্যবস্থিতম্ এ কথা স্বীকার করা যায় ?

এই বিচারস্থলে পাঠকবৃন্দ “মধ্য” শব্দের বিশিষ্ট অর্থের প্রণিধান করিবেন। একটি দ্রব্যের মধ্যে আর একটি বলিলে, আপাততঃ একটিকে বড়, অপরটিকে ছোট বলিয়া মনে হয়—দুইটিই দৈর্ঘ-বিস্তার-বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আত্মার দৈর্ঘ্য বিস্তার কেহই স্বীকার করেন না; সুতরাং আত্মার “মধ্যে” ইহার তাৎপর্য্য কি ? আত্মা ঘটপটাদির মত আয়ত না হউক, আকাশের মত আয়ত কি ? বেদান্তীদের কথার ভাবে অনেক স্থলে বোধ হয়, তাঁহারা যেন আত্মাকে আকাশের মত একটি সামগ্রী বলিয়া মনে করেন। পরমাত্মাকে তাঁহারা কখনও “পরম ব্যোম” বলিয়া উল্লেখ করেন; কিন্তু সাংখ্যেরা ঈদৃশ কল্পনায় যোগ দেন না। সাংখ্যমতে “মধ্য” শব্দের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে জ্ঞানের আকারে আকারিত এই মাত্র বুঝিতে হইবে। যেমন, স্বপ্ন, বা কল্পনা, বা স্মৃতি; তাহা শুদ্ধ জ্ঞানের আকারে আকারিত। মুকুরে যখন তুমি আপনার প্রতিবিম্ব দেখ, তখন সেই প্রতিবিম্বকে তোমার আত্মার “মধ্যে” বলিয়া

সহজেই বুঝিতে পারিবে। তাহা বাহিরে বলিয়া প্রতীয়-মান হয়, কিন্তু বাস্তবিক বাহিরে কিছুই নাই। উহা তোমার জ্ঞানের আকারে আকারিত আত্মার আভ্যন্তরীণ সামগ্রী।

লৌকিক বিশ্বাসানুসারে যাহা আত্মার অধিষ্ঠানভূত দেহ বা শরীর বলিয়া গণ্য হয়, সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েই তাহাকে একটি জ্ঞানের আকারে আকারিত পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করে; সুতরাং তাহা আত্মার বহির্ভূত নহে। এইরূপ চক্ষে দেখিলে দেহ একটি অলীক জ্ঞানময় সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায় কি না? বেদান্ত বলে, হাঁ; সাংখ্য হেঁয়ালীর মত বলে, হাঁও বটে, নাও বটে! তাৎপর্য্য এই যে, বাস্তবিক লৌকিক ভাষায় একশব্দে দুইটি পদার্থ যুগপৎ বুঝায়। ব্যক্ত দেহ ও অব্যক্ত দেহ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ; একটি লিঙ্গ, অপরটি লিঙ্গী। লিঙ্গ অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্ন; লিঙ্গী অর্থাৎ চিহ্ন দ্বারা যাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেটি লিঙ্গ, সেটি জ্ঞানের আকারে আকারিত পদার্থ; যেটি লিঙ্গী, সেটি তাদৃশ জ্ঞান-পরি-ণামের উত্তেজক কারণ। লিঙ্গী জ্ঞানের আকারে আকারিত নয়—তাই তাহাকে অব্যক্ত বলা যায়। কিন্তু

যদিও তাহা জ্ঞানের আকারে আকারিত হয় না,আমাদের আত্মা নিরন্তর তাহার স্বাধীন সত্তা অনুভব করিতেছে। যেই আত্মার জ্ঞানপরিণামের সহিত অবস্থান্তর উৎপন্ন হয়, অমনি "ঐ একটা কি?" বলিয়া স্বাধীন ভিন্ন পদার্থের উপলব্ধি হয়। দেহ সম্বন্ধে, অর্থাৎ অব্যক্ত দেহ সম্বন্ধে নিরন্তর অবিশ্রান্ত ঐরূপ উপলব্ধি হইতে থাকায়, এবং সেই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাবের সংস্রব থাকায়, আমাদের আত্মা সর্ব্বদাই সেই অব্যক্ত সত্তার স্বভাব ও কার্য্যকারণ ভাবের আন্দোলন করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ আন্দোলনকালে যে জ্ঞান-পরিণাম অব্যক্তের কার্য্য, তাহাকেই তাহার লিঙ্গ বা চিহ্নস্বরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। অবশেষে নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ আর লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ভেদ বিশেষ যত্ন ও চিন্তা ব্যতিরেকে পরিগ্রহ হয় না। লিঙ্গীর স্বাধীন সত্তা আছে বলিয়া, যখন লিঙ্গ লিঙ্গীতে অভিন্ন হইয়া পড়ে—তখন লিঙ্গীর ন্যায় লিঙ্গেরও স্বাধীন সত্তা আছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ তাহা ভ্রম। যে দেহ লিঙ্গী, তাহার স্বাধীন সত্তা আমাদের আত্মা সাক্ষাৎকার নামক প্রতীতি দ্বারা উপলব্ধি করে; অতএব তাহার স্বাধীন

সত্তা স্বতঃসিদ্ধ। আর যে দেহ লিঙ্গ (জ্ঞানময়) তাহার স্বাধীন সত্তা নাই। ইহাই হইল সাংখ্য-মত।

এই অব্যক্ত দেহ প্রকৃতি নামক পদার্থশ্রেণীর অন্তর্গত; তাহার সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ব্যক্ত দেহকে বিকৃতি বলা যায়।

এস্থলে প্রসঙ্গতঃ বলা উচিত, সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিকে অনেকে যেন একটিমাত্র পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা ভুল। সাংখ্যেরা সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ নামক তিন গুণের উল্লেখ করেন; অনেকে ন্যায়দর্শনের গুণের সহিত সাংখ্যদর্শনের গুণের গোলমাল করিয়া বসেন। প্রকৃত পক্ষে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি একটি জাতিবাচক শব্দ। প্রকৃতি এক শ্রেণীর পদার্থ; যে সকল লিঙ্গের দ্বারা প্রকৃতির সত্তা উপলব্ধি করা যায়, তদ্দ্বারা প্রকৃতি নামক পদার্থশ্রেণীর বৈচিত্র্যও অনুমিত হয়। তদ্ধেতু সাংখ্যেরা প্রকৃতি নামক মূল বা মুখ্যজাতিকে তিন অবান্তর বা গৌণ জাতিতে বিভক্ত করেন; গৌণ বলিয়া ইহাদিগকে গুণ বলা যায়। এই তিন গৌণ জাতি বা গুণের নাম সত্ত্ব, রজস্ এবং তমস্। সাংখ্যেরা এই তিন অবান্তর জাতীয় পদার্থের এইরূপ বর্ণনা করেন, যথা;—

(১)—সত্ত্ব——“সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্।”

(২)—রজস্——“চলম্ অবষ্টম্ভকঞ্চ রজঃ।”

(৩)—তমস্——“গুরু বরণকমেব তমঃ।”

যাহা লঘু এবং প্রকাশক, তাহা সত্ত্ব; যাহা চঞ্চল এবং অবষ্টম্ভক, তাহা রজস্; যাহা গুরু এবং আবরণকারী, তাহা তমস্। এই শ্রেণী-বিভাগ আমার বিবেচনায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে—কিন্তু এতদ্দ্বারা একটি কথা স্পষ্ট হইতেছে, সত্ত্ব, রজস্ বা তমসের সাংখ্যেরা ভিন্ন ভিন্ন “গুণ” ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শনে যাহাকে গুণ বলে, তাদৃশ গুণ ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু গুণের আবার গুণ কি? বিচক্ষণ সাংখ্য পণ্ডিতগণ স্বীয় শাস্ত্রের গুণকে গৌণ জাতি বলিয়াই জানেন। অবিবেকী পাঠক ভ্রমে পতিত হয়। ২১. ৬৬৭

ইহাতে সাংখ্যের মত এইরূপ দাঁড়াইতেছে। লোকে যাহাকে জড়পদার্থ বলে, তাহা ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে দ্বিবিধ। ব্যক্তের অসংখ্যতার ত কথাই নাই,—অব্যক্তও অসংখ্য; ভাগ করিলে তাহারা সত্ত্ব, রজস্ তমস্ এই তিন গৌণ বা গুণশ্রেণীর অন্তর্ভূত হয়। এই সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ শ্রেণীভুক্ত অব্যক্ত নামক পদার্থপুঞ্জ পরস্পর

মিথুনের ন্যায় সংযত হইয়া অবস্থান করে; কখনও একটি অপরকে অভিভূত করে, কখনও একটি অপরকে প্রকাশিত করে, কখনও একটি অপরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাই উক্ত হইয়াছে ;—

"অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ।"

এইরূপে পিণ্ডীকৃত ও পুঞ্জীভূত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয়, অভিব্যক্ত, বা অভিভূত করিয়া অব্যক্ত নামক পদার্থরাশি সংসারে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সেই পদার্থরাশির একদেশের সহিত "জ্ঞ" শ্রেণীভুক্ত কোন একটি পদার্থের সংযোগের নাম সাংখ্যমতে "দেহ"। সংযোগ বলিলে যেন পরিমাণবিশিষ্ট অবয়বের আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু বাস্তবিক সাংখ্যেরা "জ্ঞ" শ্রেণীভুক্ত পদার্থের তাদৃশ অবয়ব থাকা স্বীকার করেন না। সংযোগ শব্দে এ স্থলে তাঁহারা একটি "জ্ঞ-জ্ঞেয়" নামক সাক্ষাৎ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা বুঝেন। আত্মার সহিত অব্যক্তের তাদৃশ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইয়াছে বলা যায়। সংসার অর্থাৎ ব্যক্ত সংসারের আবির্ভাব এইরূপ সংযোগ বা সম্বন্ধস্থাপনের ফল। কিরূপে এই সংযোগ সিদ্ধ হয়, দর্শনশাস্ত্র তাহা জানে না।

সাধারণ লোকে বিবেচনা করে, আত্মা দেহের মধ্যে বাস করে। সাংখ্যেরা প্রথমে বিচার করিয়া বলেন—দেহ দুই প্রকার, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যক্ত দেহের স্বাধীন সত্তা তাঁহারা স্বীকার করেন না; এবং উহা কেবল জ্ঞানের আকারে আকারিত পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাদৃশ দেহ আত্মারই মধ্যগত। আর যাহা অব্যক্ত দেহ বা প্রকৃতি নামক পদার্থ-শ্রেণীর একদেশ, আমরা কেবল তাহার সত্তামাত্র অবগত আছি; তদতিরিক্ত তাহা কেমন, তাহা "অব্যক্ত"; আর্থাৎ কেবল বিবিধ জ্ঞানের কারণস্বরূপ বলিয়া তাহা আমাদের নিকট পরিচিত।

এই কথাটি একটি চিত্রের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। বৃহত্তর চক্রটিকে অব্যক্ত বা প্রকৃতি বলিয়া মনে কর, এবং আত্মা বা পুরুষ যেন তাহার নাভি মনে কর। পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা "জ্ঞ-জ্ঞেয়" নামক সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, যে ব্যক্ত রূপরসাদির আবির্ভাব হয়, সেইটিকে ক্ষুদ্রতর চক্র বলিয়া মনে কর। এই ক্ষুদ্রতর চক্রটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সীমা—কিন্তু প্রকৃতি তাহার বহিঃসীমায় অবস্থিত, তাহার অস্তিত্বের
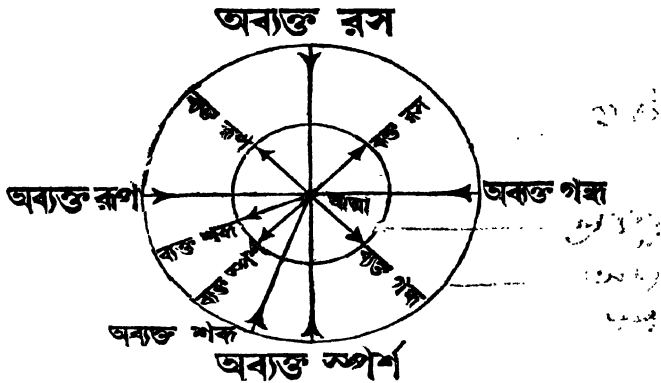
প্রতীতি ভিন্ন অধিক আর কিছু জানিবার উপায় নাই। যাহাকে আমরা ব্যক্তরূপ বলিয়া জানি, তাহা আমাদের একপ্রকার জ্ঞান ; এরূপ জ্ঞান আবির্ভাবের একটি কারণ আছে, তাহা অনুমেয়, চিত্রে তাহা অব্যক্তরূপ বলিয়া প্রদর্শিত হইল। কিন্তু তাহা আমাদের জ্ঞানের আকারে আকারিত হইবার নহে। এক্ষণে এই চক্রদ্বয়কে একটি ডমরুর দুই প্রান্ত এবং আত্মাকে মধ্য স্থল বলিয়া কল্পনা কর। নিম্নের চক্রটি "অব্যক্ত" চক্র এবং উপরের চক্রটি "ব্যক্ত" চক্র। আত্মা কেবল উপরের দিকেই রূপরসাদির উপলব্ধি করিতেছে, কিন্তু তাহাদের কারণ অধোদেশ

হইতে আসিয়া আত্মায় প্রতিঘাত করিতেছে। এ স্থলে উপরের চক্রটিকে নিম্নের চক্র বলিয়া মনে করিলে যে ভ্রম হয়, ব্যক্ত দেহকে অব্যক্ত দেহ বলিয়া মনে করিলেও তাদৃশ ভ্রম হইবে।

সংক্ষেপে সাংখ্যেরা যে পদার্থের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেন, তাহা ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ না বলিয়া জ্ঞ-জ্ঞেয়-জ্ঞান বলিলেও বলা যায়; যথা,—
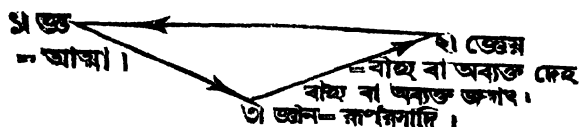
সাধারণ লোকে ২ এবং ৩ কে অভিন্ন মনে করে এবং ৩ যদিও আধ্যাত্মিক পদার্থ, তাহাকে বাহ্যিক বলিয়া মনে করে। বেদান্তীরা ২ এর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

বেদান্তীরা আরো মনে করেন, সংসারে কেবল একটি-মাত্র আত্মা আছে; সাংখ্যেরা অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এ দিকে যেমন আত্মা অসংখ্য, জ্ঞেয় পদার্থও তেমনি অসংখ্য মনে করেন, অন্যথা জ্ঞানের বৈচিত্র্যের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সাংখ্যদর্শনে আর একটি বড় সুন্দর এবং গভীর তত্ত্বের আবিষ্কার দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। সাংখ্যেরা সকল পদার্থের সংখ্যা করেন বলিয়া সংসারে তাঁহাদের নাম হইয়াছে সাংখ্য। তাঁহারা প্রশ্ন করেন, জ্ঞান কতিবিধ?

প্রথমতঃ, পদার্থ-মাত্রই হয় নিত্য বা অনিত্য। নিত্যের আদি অন্ত নাই, অনিত্যের আদি অন্ত আছে। অনিত্য উৎপন্ন হয়, বিনষ্ট হয়—আবির্ভূত বা তিরোহিত হয়। উৎপন্ন হয় বলিয়া অনিত্যের নাম "ভূত"। ভূধাতুর উত্তর "ক্ত" প্রত্যয়। সংসারে জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হয় না। সুতরাং জ্ঞানের দর্শনশাস্ত্রসম্মত একটি পারিভাষিক নাম "ভূত"।

জ্ঞান বা "ভূত" কতিবিধ?—সাধারণতঃ লোকে বলে পাঁচ প্রকার,—যথা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। কিন্তু সাংখ্য তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন, তাঁহার কৌতূহলের অবসান নাই, তিনি আবার বলেন, রূপ কতিবিধ? রস কতিবিধ?

প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই, রূপরসাদি প্রত্যেক প্রকারের জ্ঞান বা ভূত দ্বিবিধ, (১) সূক্ষ্ম ভূত (২) স্থূল ভূত। সূক্ষ্ম-ভূতের আর এক নাম "তন্মাত্র"।

বোধ করি, অপর কোন ভাষায় তন্মাত্র এইরূপ শব্দ

নাই। তৎ+মাত্র=তন্মাত্র, অর্থাৎ কেবল তাই। অর্থাৎ কেবল জ্ঞানমাত্র। দেখা যায়, সাধারণ লোকে রূপাদিকে বাহ্য বস্তু বলিয়া মনে করে। মনে কর, তোমার পুত্র তোমার সম্মুখে, তুমি তোমার পুত্রের রূপ দেখিতেছ, তোমার কি মনে হয় যে, সেই রূপ তোমার জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নয়?—কদাচ নহে। তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার পুত্রের রূপকে তোমার বহির্ভূত বলিয়া মনে কর। শাস্ত্রদৃষ্টিতে তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য হও যে, তোমার পুত্রের রূপ তোমার মনের ভিতর, কিন্তু তোমার মন তাহা মানিতে চাহে না। না মানিতে চাহারও একটি বড় নিগূঢ় কারণ আছে। একটি চিত্রের দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

যথা, মনে কর জ্ঞ এবং জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে সাক্ষাৎ-কার নামক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। "জ্ঞ"-এর উপর জ্ঞেয়ের ক্রিয়াবশতঃ জ্ঞানের উৎপত্তি হইল। জ্ঞানের এই প্রথম অবস্থার নাম তন্মাত্র বা জ্ঞানমাত্র; কেবল জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কিন্তু এই জ্ঞান অবশেষে জ্ঞেয়ের উপরে আরোপিত হয়। পূর্ব্বে যাহা আমার (জ্ঞ পদার্থের) জ্ঞানমাত্র ছিল,
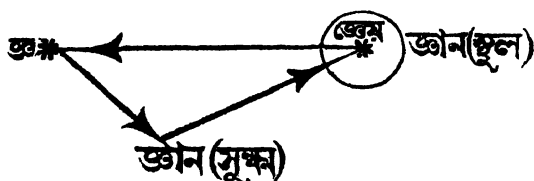
তাহা নানা কারণে জ্ঞেয়ের রূপ বা রস প্রভৃতি বলিয়া পরিগৃহীত হয়। যখন জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞান এইরূপে জড়িত হয়, তখন আর তাহাকে "তন্মাত্র" বলা যায় না; তাহাতে যেন কিছু অন্য পদার্থ মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা যেন জ্ঞেয়কে ঘেরিয়া অবস্থিত হইয়াছে। জ্ঞানের এই পরিণামের নাম স্থূলভূত।

তুমি যাহা এক্ষণে দ্রব্যের রূপরসাদি বলিয়া মনে কর, মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময়, হয় ত গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও বহুকাল, তাহা কেবল তোমার জ্ঞানমাত্র (তন্মাত্র) বলিয়া জানিতে। একটি নবজাত শিশুর চক্ষুর নিকট অঙ্গুলি লইয়া যাও, সে আদৌ চক্ষু মুদিবে না; আর আমি তোমার চক্ষুর কাছে অঙ্গুলি লইয়া যাই দেখি— তুমি একবারে চক্ষু মুদিয়া ফেল; ইহার বোধ হয় কারণ এই, বালকের আদৌ বাহ্যবস্তুর জ্ঞান এ পর্য্যন্ত বদ্ধমূল

হয় নাই—সে এখনও সকল পদার্থকেই আপনার জ্ঞান মাত্র (তন্মাত্র) বলিয়া জানে।

সাংখ্যেরা জ্ঞানের এইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম নামক শ্রেণী-বিভাগ করিয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু বৈদেশিক পণ্ডিতসমাজে এই বার্ত্তা এ পর্য্যন্ত সুপরিজ্ঞাত ও প্রচারিত হয় নাই।

৫॥ সৃষ্টি ॥

এক কথার দুই অর্থ বুঝাইলে যুক্তিস্থলে তাহার ব্যবহার বড়ই অনর্থের কারণ হয়। তজ্জন্য দার্শনিকেরা সকল সময়ে শব্দের অর্থ ও লক্ষণ নিরাকরণ বিষয়ে বড়ই যত্ন করেন। যে সকল শব্দের বহ্বর্থ-মূলক অনর্থকারিতার আশঙ্কা আছে—"সৃষ্টি" তন্মধ্যে একটি।

বেদে ও পুরাণে একপ্রকার সৃষ্টির কথা শুনা যায়। পরমেশ্বর যেরূপে, যে উপাদানে, যে অভিপ্রায়ে, যে প্রক্রিয়া দ্বারা—সাধারণ লোকে যাহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলে—তাহার উৎপাদন করিলেন, বেদে পুরাণে এইঅ তিগম্ভীর মনুষ্যবুদ্ধির সর্ব্ব প্রকারে অতীত বার্ত্তার আলোচনা দেখা যায়। তাহাকে "সৃষ্টি" বলে। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের সহিত সেইপ্রকার সৃষ্টির কোন সংশ্রব নাই। দর্শনশাস্ত্র যদি সেই পুরাবৃত্তের আলোচনা করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহার অনধিকারচর্চ্চা। তবে দার্শনিক সৃষ্টি কেমন?

সৃজ্ (বা সর্জ্) ধাতুর আদিম অর্থ বোধ হয় ত্যাগ বা, নিক্ষেপ। এই ধাতু হইতে বিসর্জ্জন, সর্গ, বিসৃষ্ট, বিসৃষ্টি সৃষ্টি ইত্যাদি শব্দ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা

আত্মা আপনার জ্ঞান-রাশিকে জ্ঞেয়ের উপর নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তদ্দারা জ্ঞেয়কে আবৃত করে—অর্থাৎ আত্মা হইতে যেরূপে স্থূলভূতের আবির্ভাব হয়—তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি। শিশুর "তন্মাত্র" যে প্রক্রিয়া দ্বারা তরুণের পঞ্চবিধ স্থূলভূতে পরিণত হয়, তাহার নাম "সৃষ্টি"। যেমন গুটিপোকাতে রেশমের কোয়া নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে তন্মধ্যস্থ করে, তদ্রূপ প্রত্যেক নরনারী যে প্রক্রিয়া দ্বারা নিজ নিজ সংসারের (ব্যক্ত জগৎ বা স্থূলভূতসংঘের) তন্তু দ্বারা আপনাকে আবৃত করে—দর্শনশাস্ত্রে তাহার নাম সৃষ্টি। ইহা বড় অদ্ভুত ব্যাপার। দর্শনশাস্ত্র এই তত্ত্ব নিরাকরণে সমর্থ। দর্শন ও দর্শনমূলক অনুমানের দ্বারা ইহার নিরাকরণ সম্ভব। ইহা আমাদের জীবনের ইতিহাসের মূলকথা। আমরা এই তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারিলে একটি উজ্জ্বল জ্ঞানরত্নের অধিকারী হই। তোমার সংসার তুমি কিরূপে নির্ম্মাণ করিলে, আমার সংসার আমি কিরূপে নির্ম্মাণ করিলাম, ইহা জানিতে কাহার না কৌতূহল হয়?—এই সংসারের ন্যায় জ্ঞানবুদ্‌বুদ অন্তর্হিত হইলে আর কি বাকী থাকিবে —ইহা জানিতে কাহার কৌতূহল না হয়?

সাংখ্যেরা এই গভীর প্রশ্নের বিস্তর আন্দোলন করিয়া যে একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের জানা অত্যাবশ্যক। আমি এক্ষণে তাহার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহা বর্ণনা করিতে ব্যাপৃত হইলাম।

আমরা দেখিতেছি আত্মার সহিত অব্যক্তের "জ্ঞ জ্ঞেয়" নামক সাক্ষাৎকার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই; এই আমি কাগজের উপর মসী দ্বারা লিপি অঙ্কিত করিতেছি। আমি হইতেছি আত্মা, আমার হস্ত, যে কাগজের উপর লিখিতেছি, মসী প্রভৃতি লেখনসাধন ইহারা মূলে অব্যক্ত, তাহাদের সহিত আমার "জ্ঞ জ্ঞেয়" নামক সাক্ষাৎকার সম্পর্ক রহিয়াছে। আমি সাক্ষাৎকার প্রতীতি দ্বারা তাহাদের সত্তা অনুভব করিতেছি—তাহাদিগকে জ্ঞেয় বলিয়া জানিতেছি—এবং মসী কালবর্ণ, কাগজ শাদা বর্ণ, তাদৃশ সম্পর্কবশাৎ আমার এবম্বিধ জ্ঞানের উদয় হইতেছে।

এই সম্পর্ক কিরূপে জন্মিল ? সাংখ্যেরা বলেন, তাহা জানি না—তাহা জানিবার উপায় নাই, তাহা অদৃষ্ট। আমরা জ্ঞানের শেষ ও চরম সীমায় দাঁড়াইয়া এই

সম্পর্ক আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি; তাহা অতিক্রম করিতে গেলে জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা হয়—তাহা অসম্ভব। সে চেষ্টা বিফল।

অতএব এইখানে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে। এইখানে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের ক্রিয়া সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে আমাদের উপলব্ধি হয় যে, এক্ষণে যাহাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সংসার, বাহ্যজগৎ বা স্থূলভূত বলিয়া মনে হয়, তাহা জ্ঞানের উপাদানে ক্রমশঃ গঠিত হইয়াছে। সাংখ্যেরা সেই ক্রমপর্য্যায় একটি আর্য্যা দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই ;—

(১) প্রকৃতের্মহাং।

(২)————স্ততোঽহঙ্কারঃ,

(৩) তস্মাচ্চ গণঃ ষোড়শকঃ।

(৪) তস্মাচ্চ ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥ ইতি॥

ইহার অর্থ এই ঃ—

১। প্রকৃতিপুরুষের সংযোগবশতঃ প্রথমে "মহৎ" নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

২। সেই "মহৎ" নামক পদার্থ হইতে ক্রমশঃ "অহঙ্কার" নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

৩। সেই অহঙ্কার হইতে ক্রমশঃ পঞ্চ "তন্মাত্র" এবং একাদশ "ইন্দ্রিয়" নামক ষোড়শবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়।

৪। সেই ষোড়শবিধ পদার্থের মধ্যে পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থ বা স্থূলভূত নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

৬ ॥ সাংখ্যদর্শনের "মহৎ" ॥

সৃষ্টিব্যাপারে যে পদার্থ সর্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন হয়, সাংখ্যেরা তাহার "মহৎ" এই নামকরণ করিয়াছেন। অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ভাষায় "মহৎ" শব্দে বড় বুঝায়। বাঙ্গালা ভাষাতেও "মহৎ" শব্দের তাদৃশ অর্থ। কিন্তু সাংখ্য অতি প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র, সুতরাং ইহার পরিভাষা কিছু অস্পষ্ট। আদিম বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় "মহস্" বা "মঘস্" নামক একটি শব্দ আছে, তাহার অর্থ জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিঃবাচক মহস্ শব্দ হইতেই "মহৎ" শব্দ উৎপন্ন। ইহার অর্থ আদিম প্রকাশ, বা প্রকাশাত্মক জ্ঞান।

প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ সাধন হইলে, অর্থাৎ জ্ঞ-জ্ঞেয় নামক সাক্ষাৎকার সম্পর্ক স্থাপিত হইলে, যে আদিম বীজস্বরূপ জ্ঞানের উদ্ভব হয়, সাংখ্যেরা তাহাকে বলেন "মহৎ"। জ্ঞানের সেই আদিম অবস্থা হইতে আমরা এক্ষণে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে, সম্প্রতি তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। যাঁহারা

সাংখ্যশাস্ত্রের টীকাকার তাঁহারা "মহৎ" অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব এই বলিয়াই ক্ষান্ত।

আমাদের পরমভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "মহতের অভিব্যক্তি" নামক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"সাংখ্যের মতে প্রকৃতি ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা এবং মহৎ সেই সাম্যাবস্থার প্রথম বিচ্যুতি—মহৎ প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি।" সংস্কৃত ভাষায় সাংখ্যদর্শনের যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহাদের ভাষা অনেকস্থলে বড় জটিল এবং অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ঐরূপ একটি জটিল ও দুর্বোধ শব্দ। সাম্যাবস্থা = অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত অবস্থা, এই এক অর্থ হইতে পারে। সেই অবস্থা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার অতীত অবস্থা। দর্শনের সীমায় প্রকৃতি নামক পদার্থপুঞ্জকে ঘোরতর সংঘট্ট ও বিলোড়ন অবস্থাপন্ন দেখা যায়। যেন সমুদ্র-মন্থনে বারিরাশির ন্যায় বিপর্য্যস্ত ও সংক্ষুভিত দেখা যায়। ইহারই নাম অসাম্যাবস্থা হইতে পারে। এবং ইহার বিপরীত ভাবকে সাম্যাবস্থা বলা যায়। ইহা ভিন্ন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা শব্দের আর কোন অর্থ পাওয়া দুষ্কর।

সৃষ্টির (অর্থাৎ দার্শনিক সৃষ্টির) প্রাক অবস্থায় অবস্থিত প্রকৃতির অন্য নাম "তমস্," * অর্থাৎ অন্ধকারময় অব্যক্ত অপ্রজ্ঞাত অলক্ষণ বস্তু। সেই তমোভূত অবস্থাকে কেবল নঙন্ত শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা যায়, ভাববাচক কোন শব্দের দ্বারা তাহার বর্ণনা অসাধ্য। সেই অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলিয়া যদি ভাববাচক কোন অবস্থার পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হয় তাহা বিফল। আমার মতে সাম্যা-বস্থা এই শব্দটি সাংখ্যদর্শন হইতে বর্জ্জন করিলে ভাল হয়। "মহৎ সেই সাম্যাবস্থার প্রথম বিচ্যুতি" † ইহার অর্থ কি ? লেখক মহাশয় নিজেই ইহা পরিষ্কার করিবার জন্য লিখিয়াছেন "মহৎ প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি"—অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, বা আবির্ভাব, বা প্রকাশ। সে প্রকাশ কোথায়, আত্মা ভিন্ন আর

* মনুসংহিতায় "আসীদিদং তমোভূতং" ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণে এই অর্থে "তমস্" শব্দ ব্যবহৃত। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

† "বিচ্যুতি" শব্দের অর্থ এখানে ভঙ্গ বা স্খলন। "সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি"র অর্থ সাম্যভঙ্গ, অর্থাৎ সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থায় পরিণতি। সাংখ্যের মতে গুণসাম্যের বিচ্যুতি না হইলে প্রকৃতি হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কোথায় সম্ভব ?—আত্মাতে বা আত্মার জ্ঞানেতে প্রকৃতির প্রথম বিকাশের নাম মহৎ। যদি শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়ের ইহা মর্ম্ম হয়, তাহা ঠিক কথা, কিন্তু তাহাকে "সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি" বলাতে "মহৎ" যেন প্রকৃতিরই কোন অবস্থাভেদ বলিয়া মনে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা। সেই প্রথম বিকাশেই প্রকৃতির ঘোরতর চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যায় সত্য—কিন্তু তাহাকে প্রকৃতির অবস্থা পরিবর্ত্তন বলা যায় না। লেখক মহাশয় পরে লিখিয়াছেন, "সাংখ্যদর্শন মহৎশব্দের যেরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে মহৎ শব্দে বুদ্ধি পর্য্যন্তই বুঝায়, তাহার উপরে আর কিছু বুঝায় না। কিন্তু বেদান্তদর্শন সাংখ্যের বিরুদ্ধে বেদের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ সকল বুদ্ধি মহৎ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, কেবল 'যা প্রথমজস্য হিরণ্যগর্ভস্য বুদ্ধিঃ সা সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং প্রথমা প্রতিষ্ঠা, সেহ মহান্ আত্মেত্যুচ্যতে।'—প্রথমজাত হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি যাবতীয় বুদ্ধির প্রথম প্রতিষ্ঠা তাহাই মহান আত্মা বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে—তাৎপর্য্য এই যে, তাহাই মহৎ শব্দের বাচ্য। সাংখ্যের বিরুদ্ধে বেদান্তের এই যে প্রতিবাদ ইহা অসঙ্গত নহে, কেন না, যে বুদ্ধি

আদিসৃষ্টি তাহা যে তোমার আমার যে সে ব্যক্তির বুদ্ধি, একথা হইতেই পারে না।”

আমরা বিনীতভাবে বলিতে চাই, দর্শনের সীমায় বেদকে আনা অনুচিত। লেখক মহাশয় সাংখ্যের বিরুদ্ধে যে বেদান্তের প্রতিবাদের উল্লেখ করেন, তাহা বেদান্তেরই বুঝিবার ভ্রম—It is not that Homer nods but we that sleep ! সাংখ্যেরা যে সৃষ্টির কথা বলেন তাহা আদৌ বৈদিক সৃষ্টি নহে, তাহা দার্শনিক সৃষ্টি—তাহা স্থূলভূতের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা। সাংখ্যের মতে প্রত্যেক মনুষ্য আপন আপন স্থূলভূতের (অর্থাৎ সংসারের) সৃষ্টি-কর্ত্তা। তুমি যে অলীক সূর্য্যকে দেখিতেছি বলিয়া মনে কর, তাহা তোমার সৃষ্টি নয় ত কাহার সৃষ্টি ? তুমি মরিয়া গেলে আর সে সূর্য্য কোথায় থাকিবে ? এমন কি, তুমি চক্ষু মুদিলে সে সূর্য্য বিলুপ্ত হয়। সে বস্তু তোমার চক্ষে প্রতিবিম্ব মাত্র। অতএব প্রত্যেক নরনারীর আত্মায় প্রকৃতি সংযোগ জন্য যে প্রথম জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহার নাম “মহৎ” ; তাহা প্রকৃতই তোমার আমার যে সে ব্যক্তির বুদ্ধি। *

* মাননীয় লেখক মহাশয় এখানে যেরূপ মত ব্যক্ত করিয়া-

এস্থলে বুদ্ধি শব্দে কোন শক্তি বুঝিলে ভ্রম হইবে। বুদ্ধি=বোধ। সাংখ্যেরা কেহ কেহ এই মহৎ বা বোধকে "প্রকৃতির বিকৃতি" বলিয়া বর্ণনা করেন। তাহাতে আমি এইরূপ অর্থ বুঝি যে, তাহা প্রকৃতির সংযোগ জন্য আত্মার বিকৃতিভাব, অর্থাৎ জ্ঞানের পরিণাম বিশেষ। সেই জ্ঞানে প্রকৃতির অব্যক্ত সত্তার আভাস আছে।

আত্মা স্বভাবতঃ চৈতন্যময়, প্রকৃতির সহিত অসংযত অবস্থায় আত্মার শুদ্ধ চৈতন্য কীদৃশ, অথবা প্রকৃতি হইতে ভিন্নজাতীয় পদার্থের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার সম্পর্ক স্থাপিত হইলে তাহার জ্ঞানের কিরূপ পরিণতি হয়, তাহা

ছেন তাহা স্পষ্টই একপ্রকার মায়াবাদ। কিন্তু সাংখ্যের মূলমত মায়াবাদ নহে; সাংখ্যের মূলমত প্রকৃতিবাদ। সাংখ্যের মতে "জ্ঞ" ভিন্ন আর যাহা কিছু সমস্তই প্রকৃতির অনুলোম পরিণাম। পুনশ্চ প্রকৃতি সাংখ্যের মতে জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। জ্ঞানের সহিত প্রকৃতির যে সূত্রে সম্বন্ধ ঘটে, সাংখ্য তাহাকে বলেন "আকৃতি" অর্থাৎ একপ্রকার অন্ধপ্রবৃত্তি। যেমন বৎসদৃষ্টে গাভীর দুগ্ধ অজ্ঞাতসারে নিঃসৃত হয়, তেমনি প্রকৃতি পুরুষের ভোগমোক্ষসাধনের উদ্দেশে অজ্ঞাতসারে কার্য্য করে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দর্শনশাস্ত্রের অতীত বিষয়। তবে প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইলে আত্মার চৈতন্যের যে ভাবান্তর ঘটে—তাহা সাংখ্যেরা একটি বিকৃতিভাব বলিয়া মনে করেন। এই বিকৃতচৈতন্যের প্রথম উন্মেষের নাম "মহৎ"—ইহাই বোধ হয় প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যদের অভিপ্রায় ছিল।

সাংখ্যদের মতে মহতে আমি এইরূপ বোধ নাই। সেই বোধকে তাঁহারা "অহঙ্কার" এই সংজ্ঞা দেন। পরে এই অহঙ্কারতত্ত্বের আলোচনা আসিবে। এক্ষণে ইহাই প্রণিধানের যোগ্য যে, সাংখ্যমতে যাহা প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ জন্য আদিম জ্ঞান বা বোধ, তাহাতে "আমি বা আমার" এইরূপ কোন অনুভবের বিকাশ নাই।

কোন্ সময়ে মহতের আবির্ভাব হয় তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। নূতন মনুষ্য পুরাতন মনুষ্য হইতে গঠিত হয়। অর্থাৎ প্রকৃতির যে অংশের সহিত পুরুষের সাক্ষাৎ জ্ঞ-জ্ঞেয় সম্পর্ক সম্ভব (=দেহ) সেই অংশ দুই ভাবে অবস্থিত দেখা যায়,—নর ও নারী। তাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন দুইটি অংশের একত্রীভাব সংঘটিত না হইলে তাদৃশ অপর একটি অংশ জন্মে না। নারী-অংশের গর্ভে এই অভিনব অংশের উৎপত্তি। সেই গর্ভাবস্থাতেই তদংশে পুরুষ

বা জড় শ্রেণীর পদার্থবিশেষের সংযোগ সংসাধিত হয়; কিরূপে কোন দিনে হয়, তাহা ঈশ্বর জানেন। তবে দেখা যায় যে, যখন শুক্রশোণিতভাবে তাহা অবস্থিত, তখন তাহাতে চৈতন্যের কোন লক্ষণ নাই; আর যখন তাহা হস্তপদাদি অবয়ব সংযুক্ত হইয়া গর্ভ হইতে চ্যুত হয়, তখন তাহাতে চৈতন্যের লক্ষণ বিদ্যমান। অতএব এই উভয় ঘটনার মধ্যেই মহতের আবির্ভাব হয়।

ইহাতে দেখা যায় গর্ভস্থ শিশুর আদিম জ্ঞানের নাম "মহৎ"। সে কিরূপ জ্ঞান? তখন চক্ষু মুদ্রিত, অতএব বর্ণজ্ঞান নাই; কাণে কিছু শুনা যায় কি না বলা যায় না। নাসিকায় কিছু গন্ধ অনুভব হয় কি না বলা যায় না। তবে শ্বাসপ্রশ্বাস না থাকা, গন্ধানুভব না থাকাই সম্ভব। তখন আহার নাই—সুতরাং রসেরও বোধ নাই। তবে ত্বক ও মাংসপেশী দ্বারা শীতোষ্ণ জ্ঞান ও অবরোধের জ্ঞান হয়, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। তৎসঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের জ্ঞানও হয় তাহা অনুমান করা যাইতে পারে, কেন না, শিশু গর্ভেই হস্তপদ চালনা করে; তাহা ইচ্ছার কার্য্য এবং সেই ইচ্ছা সুখ বা ক্লেশানুভব জন্য হওয়াই সম্ভব। বোধ হয় শীতোষ্ণের

অনুভব, অবরোধের অনুভব, সম্ভবতঃ একপ্রকার শব্দের অনুভব পিণ্ডীভূত হইয়া আদিম জ্ঞানে বিকশিত হয়; তৎসঙ্গে সুখদুঃখের অনুভবও জড়িত থাকে। তাহাই সাংখ্যদের “মহৎ”।

---

৭ ॥ সাংখ্যদর্শনের অহঙ্কার ॥

আমি, আমার, আমাতে, ইত্যাদি "অহং" অনুভবকে সাংখ্যেরা বলেন "অহঙ্কার"। ভাষা কথায় অহঙ্কার শব্দের অর্থ গর্ব্ব, নিজের উৎকর্ষাভিমান; কিন্তু সাংখ্যদর্শনের অহঙ্কার সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ।

সাংখ্যেরা বিবেচনা করেন, উপর্য্যুপরি এক বা নানাবিধ জ্ঞানের উদয় না হইলে আমি বা আমার জ্ঞান হইতেছে, এরূপ অনুভব হয় না। নাস্তিকেরা বলে, অহংজ্ঞান জ্ঞানের ধারাবাহিকতার ফল। সাংখ্য ও বেদান্তীগণের "সোঽহং" এইরূপ বাক্যবিন্যাসে তাঁহারা অহংজ্ঞানকে স্মৃতির ফল বলিয়া মনে করেন এইরূপ বোধ হয়। সাংখ্যশাস্ত্রে অহংজ্ঞান বা অহংকারের অপর নাম অধ্যবসায়। এস্থলেও বাঙ্গলা অধ্যবসায় বুঝিলে চলিবে না। অকৃতকার্য্য হইয়াও পুনঃপুনঃ চেষ্টা করাকে বাংলায় অধ্যবসায় বলে। (এই অনুভব আমার—আমি দেখিতেছি—আমি শুনিতেছি, এইরূপ নিশ্চয়ের নাম অধ্যবসায়।)

ফলতঃ সাংখ্যশাস্ত্রের অহংকারতত্ত্বের বিচারটি অতীব হৃদয়গ্রাহী। ক্ষণিক জ্ঞানরাশির মধ্যে আত্মাকে নিত্য বলিয়া অনুভব করার নাম অহংকার। একের ক্ষণিকত্ব, অপরের স্থায়ীত্ব, এই অনুভবে পরিস্ফুট হয়। অর্থাৎ তুলনা দ্বারা পরিস্ফুট হয়। সুতরাং জ্ঞানের ক্ষণিকত্বের পরিচয় প্রথমে না পাইলে আর আত্মার নিত্যত্বানুভবের বিকাশ হইতে পারে না। আদিম জ্ঞানের অবস্থা বোধ হয় এইরূপ, যথা—"উষ্ণ", "কোমল," "শীতল," "মধুর", "ক্লেশ" ইত্যাদি। এই অবস্থা উত্তরোত্তর আর একভাবে দাঁড়ায়, যথা, "এই উষ্ণ অনুভব করিতেছিলাম, এই শীতল অনুভব হইতেছে"—"এই মধুর বোধ হইতেছিল, এই ক্লেশ বোধ হইতেছে"। প্রথম প্রকার জ্ঞানে অহঙ্কারের বিকাশ নাই; দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানে অহঙ্কারের বিকাশ দেখা যায়।

এস্থলে একটি প্রশ্নের উদয় হয়—জ্ঞান ত আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম; সুতরাং মহতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে জ্ঞান ছিল না, তাহা কিরূপে বলিব? তাহা হইলে মহতের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বের যে জ্ঞান তাহার সহিত তুলনায় যে মহতের সঙ্গে সঙ্গেই অহংকার

আসিবে ? এমন কি মহতের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও যে আত্মাতে অহঙ্কারের সম্ভাব ছিল না, তাহাই বা কিরূপে প্রতিপন্ন হয় ?

প্রশ্নটি বড়ই কঠিন। কিন্তু প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যেরা মহতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আত্মার যে বিশুদ্ধ চৈতন্য থাকে তাহা "অদৃষ্ট"তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেন। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে আত্মার একপ্রকার চৈতন্যের উদয় হয়, তাহাকেই তাঁহারা মহৎ বলেন। সেইরূপ বিকৃত চৈতন্যের মধ্যেও আত্মার নিত্যত্বের জ্ঞানের নাম অহঙ্কার; শুদ্ধ চৈতন্যাবস্থায় আত্মার স্বীয় নিত্যত্ব জ্ঞান কি প্রকার তাহা জানিবার উপায় নাই। মহতের আবির্ভাবের পূর্ব্বের সকল কথাই "অদৃষ্ট" বিবেচনা করিয়া সাংখ্যেরা বলেন, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিকৃত অহংজ্ঞান আদিম জ্ঞানে বিকাশ পায় না।

৮ ॥ তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় ॥

অহঙ্কার স্ফূর্ত্তি হইলে আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি উদাসীন, আমি ক্রিয়াবান, জ্ঞানের আকার এইরূপ ধারণ করে। রূপরসাদির মিশ্রিত পিণ্ডীকৃত জ্ঞান ক্রমশঃ বিযুক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া এটি রূপ, ঐটি রস, সেটি গন্ধ, ওটি স্পর্শ, এইটি শব্দ, এইপ্রকার পৃথক পৃথক অনুভবের অঙ্গ গঠিত হইতে থাকে। অগ্রে যেন রূপরস সব জড়াইয়া একটা তালবাঁধা গোছের ছিল—ক্রমশঃ তাহাদের পার্থক্য বিশ্লিষ্টীকৃত হইতে থাকে। অবশেষে সকলপ্রকার প্রত্যক্ষানুভব বিযুক্ত হইয়া যেন এক এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনুভব সকল আমারই অনুভব, উহারা আমারই জ্ঞান, এ সংস্কার বিদ্যমান, উহা যে বহিঃস্থ কোন দ্রব্যের গুণ তাহা পরিগ্রহ হয় না। এই অবস্থায় জ্ঞান "তন্মাত্র" বা জ্ঞানমাত্র। সাংখ্য পরিভাষায় ইহার নাম সূক্ষ্মভূত। মহৎ ও অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্মভূতের আবির্ভাব হয়।

সাংখ্যেরা আরো বলেন যে, তন্মাত্র স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মা আপনার শক্তি বা ঐশ্বর্য্যের (ঈশ্বরভাবের) অর্থাৎ ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। যখন রূপরসাদি পিণ্ডীকৃত থাকে, তখন কোথা হইতে যে হইতেছে তাহা বুঝা যায় না। অবশেষে যখন অন্যান্য জ্ঞানের সহিত রূপজ্ঞানের পার্থক্যসাধন হয়, তখন রূপজ্ঞান হওয়া না হওয়ার পক্ষে আত্মার নিজের শক্তিচালনায় অবকাশ আছে; একপ্রকার ক্রিয়া (যাহাকে এক্ষণে আমরা চক্ষু উন্মীলন বলি) করিলে রূপজ্ঞান হয়, আর এক প্রকার ক্রিয়া (যাহাকে আমরা চক্ষু নিমীলন বলি) করিলে রূপজ্ঞান হয় না—তাদৃশ ক্রিয়ার করণে বা অকরণে আমাদের শক্তি আছে, এইরূপ ধারণা জন্মে। এই শক্তির নাম "ইন্দ্রিয়"। ইন্দ্র=শক্তিমান। ইদি পরমৈশ্বর্য্যে—এই ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। বেদে পরমেশ্বরের নাম ইন্দ্র। তিনি শক্তিমান বলিয়াই তাঁহার নাম ইন্দ্র। দর্শনশাস্ত্রে আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞানশক্তির নাম ইন্দ্রিয়।

ভাষা কথায় ইন্দ্রিয়শব্দে চোখ্ কান্ ইত্যাদি বুঝায়; সাংখ্যেরা তাহা বুঝেন না। যাহাকে আমরা সচরাচর

চোখ্ কান্ বলি, তাহা ত' একপ্রকার জ্ঞানমাত্র সাংখ্যমতে বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের কোনপ্রকার সংস্রব নাই, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় কোনপ্রকার বাহ্যবস্তু নহে। (আত্মার যে শক্তি দ্বারা রূপতন্মাত্রের জ্ঞান হয়, তাহা একপ্রকার ইন্দ্রিয়—দর্শনেন্দ্রিয়, যে শক্তি দ্বারা রসতন্মাত্রের জ্ঞান হয়, তাহা একপ্রকার ইন্দ্রিয়—রসনেন্দ্রিয়, ইত্যাদি।)

জ্ঞানশক্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মশক্তির ও অনুভবেরও উদয় হইয়া থাকে। রূপজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু উন্মীলন ও নিমীলন নামক ব্যাপারের জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রথমতঃ এই ক্রিয়া স্বাভাবিক ও প্রযত্নশূন্য। তেমনি আদিম হস্তপদাদির চালনাও স্বাভাবিক ও প্রযত্নশূন্য, কিন্তু ক্রমশঃ উহা আত্মার প্রযত্নবিশেষের কার্য্য বলিয়া উপলব্ধি হইতে থাকে। এইরূপে তন্মাত্রস্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হয়। সাংখ্যেরা ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন—চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন নামক মিশ্র উভয়েন্দ্রিয়। আমরা এস্থলে এই সংখ্যা-নির্ণয়ের দোষগুণবিচারে কালহরণ করিব না।

৯ ॥ স্থূলভূত ॥

এক দিকে আত্মায় জ্ঞানের যেমন ঈদৃশ পরিণতি সংসাধিত হইতে থাকে, তেমনি অপর দিকে অব্যক্তের অস্তিত্বানুভব বদ্ধমূল হইতে থাকে। অব্যক্তের সহিত আত্মার "জ্ঞ-জ্ঞেয়" সাক্ষাৎসম্বন্ধ; সুতরাং মহতের আবির্ভাবের সমকালেই আমরা অব্যক্তের সত্তা অনুভব করি। কিন্তু সে অনুভব কি একটা এইরূপ অপ্রকাশ-ময় সত্তার অনুভবমাত্র। পরে যখন অহঙ্কারের আবি-র্ভাব হয়, সেই সঙ্গে অব্যক্তের অনুভব যেন আরো একপদ অগ্রসর হয়, তখন কি একটা আমাকে অভিভূত করিতেছে এইরূপ প্রতীতি জন্মে। তাহার পর আবার যখন আত্মা আপনার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞানকে পরস্পর পৃথক বলিয়া অনুভব করে—এটি আমার রূপজ্ঞান, এটি আমার রসজ্ঞান, এই প্রকারে অনুভব করে, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ কি একটা আমাতে রূপের জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি করিয়া দিতেছে এইরূপ অনুভব হয়; এখন অব্যক্তের অনুভব আরো

যেন একপদ অগ্রসর হইল। এই অবস্থায় আবার আত্মা আপনার জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তি অনুভব করিয়া দেখে যে, সেই শক্তি অব্যক্তের শক্তি দ্বারা নিয়মিত। যেমন ইচ্ছা তেমন জ্ঞান, যেমন ইচ্ছা তেমন কর্ম্ম হয় না! আশ্চর্য্য !! একি? ইচ্ছা করি, বা না করি, আমাকে নানা প্রকার অনুভবে অভিভূত করিতেছে ওটা কি?—এইরূপে ওটা কি—এটা কি, করিয়া অব্যক্তের আমরা কোন অন্তই পাই না—তাহা যেমন গোড়ায় অব্যক্ত, শেষেও তেমনি অব্যক্ত। আমরা আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া তাহার রঙ্গ দেখিতে থাকি। তাহা আমাদিগকে হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে; তাহার আবেগে আমরা চঞ্চল; হাসিয়া আবার কিরূপে সেইরূপ হাসি হইবে তাহার চেষ্টা, কাঁদিয়া আবার কিসে সেরূপে কাঁদিতে না হয় তাহার চেষ্টা। ক্রমশঃ অব্যক্তকে নিগূঢ়রূপে জানিবার পিপাসা অসহ্য হইয়া দাঁড়ায়। সমুদয় জীবন সেই অব্যক্তের আন্দোলনে তাহার বিতর্কে ব্যাপৃত ও পর্য্যবসিত হইতে থাকে। সাংখ্যশাস্ত্রের ভাষায় "আত্মা প্রকৃতিকে দেখিতে ব্যাকুল হয়"—এবং অবশেষে এক কৌশল অবলম্বন করে। মনে কর একটি নদীতে একটি

বৃক্ষ নিমগ্ন আছে, নদীর স্রোতে নৌকা তাহার উপরে পড়িয়া বিনষ্ট হয়। তখন যেমন নাবিকেরা সেই জলমগ্ন বৃক্ষকে জানিবার জন্য সেই স্থলে একটি ধ্বজা পুতিয়া দেয়— সেই ধ্বজা দেখিয়া জলমগ্ন বৃক্ষের বিষয় অবগত হয়—তদ্রূপ আত্মা অন্ধকারমগ্ন "তমোভূত" "অপ্রজ্ঞাত" "অলক্ষণ" অব্যক্ত প্রকৃতিতে তাহাকে ব্যক্তকরণাভিপ্রায়ে রূপরসাদির নিশান নিখাত করে। ইহার নাম সর্গ বা সৃষ্টি; রূপরসাদি আত্মা হইতে বিসৃষ্ট হইয়া যেন প্রকৃতির উপরে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং প্রকৃতির ধ্বজা, নিশান, কেতু, বা লিঙ্গ, বা আবরণস্বরূপ হইয়া উঠে। অর্থাৎ সাংখ্যদের পরিভাষায় সূক্ষ্মভূত স্থূলভূতে পরিণত হয়।

জ্ঞানই আত্মার আবরণস্বরূপ; সেই জ্ঞান যখন প্রকৃতির নিশানস্বরূপ পরিকল্পিত হইয়া অবশেষে প্রকৃতির সহিত অভিন্ন ভাব ধারণ করে—তখন আত্মাকে,প্রকৃতিকে, আপনার আবরণ বলিয়া ভ্রান্ত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? প্রকৃতির যে অংশের সহিত আত্মার সাক্ষাৎকার সম্পর্ক, তাহা এক্ষণে আবরণকারী দেহ বলিয়া পরিকল্পিত হয়। প্রকৃত পক্ষে স্বীয় জ্ঞানাবরণের সহিত আত্মার

অভেদ ; কিন্তু সেই জ্ঞানাবরণ যখন "দেহ" বলিয়া পরিকল্পিত হয়—তখন আত্মা দেহের সহিত আপনাকে অভিন্ন বোধ করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। এইরূপে আমরা স্বীয় স্বীয় ঘরদ্বার, পুত্রকলত্র, বন্ধুপরিজনের গঠন করিয়া সংসারমহার্ণবে পতিত হই।

১৩॥ প্রকৃতিবাদ ও মায়াবাদ॥

কোনও কুশল শিল্পী যখন কোনও একটি মনুষ্যের চিত্র অঙ্কিত করেন, বা প্রতিমূর্ত্তি গঠন করেন, আদর্শের সহিত চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তির সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমরা মোহিত হই, এবং কতই প্রশংসা করি ; সেই অনুকরণ-বিদ্যার নাম "মায়া" ; কেন না, শিল্পী মাপজোঁখ করিয়া তাদৃশ চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি রচনা করেন। মা=মাপকরণ, বা দৈর্ঘ্যবিস্তারের পরিচ্ছেদকরণ। হাত যদি এত বড় হয়, পা কত বড় হইবে, শিল্পশাস্ত্রে তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা আছে। সেই পরিমাণ অনুসারে রচিত হয় বলিয়া শিল্পের নাম মায়া। কিন্তু আমরা মায়াকে যতই প্রশংসা করি না কেন, মায়ারচিত অনুকরণ যে অনুকরণমাত্র, তাহা যে মূল বা স্থায়ী পদার্থ নহে, তাহা যে অলীক ও মিথ্যা, ইহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হই না।

এতাবতা, যাহা সত্য না হইয়াও সত্যের মত দেখায়, যাহা সত্যের ভ্রম জন্মায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক মিথ্যা বা অলীক, তাহাও ক্রমশঃ মায়া শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

মায়া একপ্রকার মিথ্যা আকৃতি মাত্র; তাহা যেরূপ দেখায়, প্রকৃত সেরূপ নহে; তাহা মনে কেবল ভ্রম জন্মায়।

পক্ষান্তরে যাহা সত্য বা স্থায়ী, যাহা কেবল আঁকা নয়, প্রকৃত, তাহার নাম প্রকৃতি, বা মূলপ্রকৃতি। ইহা নিত্য, কাহারও দ্বারা রচিত নহে। ইহার পরিবর্ত্তন, ক্ষয়, বা বিকার নাই; ইহা সর্ব্বদাই একরূপ; ইহা অচল, অটল, কূটস্থ। ইহাতে মনে কোনও প্রকার ভ্রান্তি উৎপাদন করে না।

বেদান্ত মায়াবাদ; অর্থাৎ বেদান্তে বলে যে, জগৎ ভ্রান্তিজ্ঞানমাত্র। সূর্য্যচন্দ্র, তরুলতা প্রভৃতি যাহা "আছে" বলিয়া আমরা মনে করি, বাস্তবিক তাহা কিছুমাত্র নাই, সে সব অলীক; আমরা নিদ্রিত অবস্থায় যেমন স্বপ্ন দেখি, জাগ্রৎ অবস্থাতেও সেইরূপ একপ্রকার স্বপ্ন দেখি মাত্র। উভয়প্রকার স্বপ্নই মিথ্যা।

সাংখ্য প্রকৃতিবাদ; অর্থাৎ সাংখ্য বলে না জগৎ ভ্রান্তি-জ্ঞানমাত্র; সূর্য্যচন্দ্র, তরুলতা, প্রভৃতি যাহা আছে বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক তাহা সকলই আছে, তাহা মিথ্যা নহে, তাহা প্রকৃত ঃ নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে ও জাগ্রৎ

অবস্থায় জ্ঞানে মহৎ প্রভেদ; উভয়ই তুল্য অলীক নহে।

এই বিচারস্থলে সাংখ্যেরা জগৎসংসারকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন—"ব্যক্ত" জগৎ যাহা প্রতীয়মান; আর "অব্যক্ত" জগৎ যাহা প্রকৃত বা প্রকৃতি। আমরা এই উভয়ের ভেদ পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

সাংখ্যেরা "মায়া" শব্দ আদৌ ব্যবহার করেন না; না করিয়া ভালই করিয়াছেন। রূপকমূলক শব্দ তর্কশাস্ত্রে বড়ই অনর্থের মূল। তাঁহারা "মায়াময়" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "ব্যক্ত" এই শব্দ ব্যবহার করেন। বেদান্তী যখন বলেন, এই সংসার "মায়াময়", সাংখ্য তখন বলেন, ইহা "ব্যক্ত"। এ পর্য্যন্ত উভয়ের অর্থ অনেকটা সমান; উভয়েই সংসারকে জ্ঞানের পরিণাম বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু বেদান্তীর ন্যায় সাংখ্য তাদৃশ সংসারকে অলীক বা ভ্রমজ্ঞান বলিতে চান না; তিনি অলীকের পরিবর্ত্তে বলেন ক্ষণিক; ভ্রমজ্ঞানের পরিবর্ত্তে বলেন তাহা প্রকৃতির লিঙ্গ, বা পরিচায়ক চিহ্ন। যে সূর্য্যকে আমরা দেখিতেছি বলিয়া মনে করি, তাহা যদিও প্রকৃতি বা প্রকৃত সূর্য্য নয়, তত্রাচ তাহা অলীক নহে,

তাহাও একপ্রকার পদার্থ, তবে তাহা ক্ষণিক ; এবং তাহাতে প্রকৃত সূর্য্য কিরূপ, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বেদান্ত ও সাংখ্যের মধ্যে ঘোরতর বিবাদের স্থান এই যে, বেদান্তে বলে, "মায়ার" অর্থাৎ প্রতীয়মান জগতের পশ্চাতে "ঈশ্বর," সাংখ্য বলে, "অব্যক্তের" অর্থাৎ প্রতীয়মান জগতের পশ্চাতে ঈশ্বর নহে, "প্রকৃতি"। সংসারের জ্ঞানকে বেদান্তে, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় বা শুক্তিতে রজতজ্ঞানের ন্যায় ভ্রমজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করা হয় ; কিন্তু সর্পের স্থানে যে একটা রজ্জু আছে, এবং রজতের স্থানে যে একটা শুক্তি আছে, তদ্বৎ সংসারের স্থানে যে একটা কিছু আছে তাহা বেদান্ত অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হন ; এবং সেই একটা কিছুকে বলেন, ইহা ঈশ্বর। সাংখ্যেরা সেই একটা কিছুকে ঈশ্বর বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। তাদৃশ ঈশ্বর তাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা কেবল অব্যক্ত বলিয়াই ক্ষান্ত ; ইহাতে তাঁহারা বিশেষ বুদ্ধিমত্তা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

সংক্ষেপে মায়াবাদ ও প্রকৃতিবাদে সাদৃশ্য এই যে,

উভয়েই প্রতীয়মান সংসারকে জ্ঞানের পরিণাম বলিয়া অঙ্গীকার করে; এবং প্রভেদ এই যে, সেই প্রতীয়মানের মূলে যে পদার্থ আছে, তাহাকে মায়াবাদে বলে, ঈশ্বর, প্রকৃতিবাদে বলে প্রকৃতি। ঈশ্বর চৈতন্যময়, প্রকৃতি জড়; ঈশ্বর এক ও অখণ্ড, প্রকৃতি বহু ও খণ্ডিত; ঈশ্বর নির্গুণ বা গৌণ পদার্থে অবিভাজ্য, প্রকৃতি সগুণ বা গৌণ পদার্থে বিভাজ্য। পরস্পরের মধ্যে এই যে অনৈক্য তাহা সামঞ্জস্যের অতীত; যিনি সাংখ্যের প্রকৃতিবাদকে অঙ্গীকার করিবেন, তিনি আর বেদান্তের মায়াবাদ অঙ্গীকার করিতে পারেন না; করিলে পরস্পরের বিরুদ্ধ মতের অবলম্বন করা হয়।

এক্ষণে ভরসা করি, আমরা পূর্ব্বে সাংখ্যমতের যেরূপ বিবরণ দিয়াছি, তাহাকে আর কেহই একপ্রকার মায়াবাদ বলিয়া মনে করিবেন না।

১১॥ মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব, পুরুষ হইতে অভিব্যক্ত হয় না প্রকৃতি হইতে ?

আমার বিবেচনায় এই বিষয়ে প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যদের সহিত অর্ব্বাচীন সাংখ্যদের ঐকমত্য ছিল না। অর্ব্বাচীন সাংখ্যেরা বলেন,

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

ইহাতে মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতিকে স্পষ্টাক্ষরে প্রকৃতির বিকৃতি বলা হইয়াছে। যাহা প্রকৃতির বিকার, তাহা অবশ্যই প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত; পুরুষ হইতে নহে। "প্রকৃতের্মহান্" ইত্যাদি কারিকাতেও প্রকৃতি হইতে মহৎ অভিব্যক্ত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়।

প্রবাদ এই যে, কপিল নামক একজন ঋষি সাংখ্য-দর্শনের আদি আচার্য্য। কপিল স্বীয় মত আসুরি নামক এক শিষ্যকে প্রদান করেন। সেকালে গুরুশিষ্যপরম্পরায় বিদ্যা পরিরক্ষিত হইত, গুরু আপনার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে যাহাকে সমধিক বুদ্ধিমান বোধ করিতেন, তাহাকে বিশিষ্টরূপে আপন মত বুঝাইয়া দিয়া মরণান্তে আপনার প্রতিনিধি স্থির করিয়া যাইতেন। আচার্য্য

আসুরির নিকট হইতে অন্যান্য শিষ্যপরম্পরায় কপিলের প্রবর্ত্তিত দর্শনশাস্ত্র লোকে রক্ষিত ও প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। এই শিষ্যপরম্পরা মধ্যে পঞ্চশিখাচার্য্য ও ঈশ্বরকৃষ্ণ বিশেষ বিখ্যাত। আদি সাংখ্যাচার্য্য কপিল ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া প্রবাদ; তাহা কত দূর সত্য, বলা যায় না। সম্ভবতঃ অবিবেকী লোকে ঈশ্বরের যে রূপ গুণ কল্পনা করে, কপিল তাহার প্রতিবাদ করিতেন, তাহাতেই তাঁহার "নিরীশ্বর" বলিয়া খ্যাতি হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাও শুনা যায় যে, কপিল বেদ মানিতেন। যিনি বেদ মানেন, তিনি যে ঈশ্বর মানেন না, ইহা অসম্ভব। সে যাহা হউক, এক্ষণে যাহা কপিলের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা তাঁহার পরকালবর্ত্তী শিষ্য-পরম্পরা দ্বারা অনেক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপরে যে কারিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা। ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে মহৎ প্রভৃতি। প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহা কোন মতে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অর্ব্বাচীন সাংখ্যদর্শন নানাবিধ বিসম্বাদী মতে সমাকুল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনেক লোকের মত বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে একত্র

কোন শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইলে যেরূপ বিসম্বাদ ঘটনা সম্ভব, এ স্থলে তাহাই ঘটিয়াছে।

মহৎ অর্থাৎ বোধ, বা বুদ্ধি। তাহা কি কখনও জড়ের ধর্ম্ম হইতে পারে, না জড় হইতে অভিব্যক্ত হইতে পারে? *যদি তাহাই সম্ভব হয়, তবে আর স্বতন্ত্র আত্মা বা পুরুষ* স্বীকার করার কোন আবশ্যকতা থাকে না।

আদিম সাংখ্যপরিভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায়, পুরুষ বা আত্মার নাম "জ্ঞ"। জ্ঞানই আত্মার লক্ষণ। সংসারে কি আছে, ইহার উত্তরে সকল পদার্থেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, কিন্তু জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের মূলভিত্তি। যে ব্যক্তি ঘোরতর নাস্তিক, সেও জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করে। সাংখ্য দার্শনিক জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই একদিকে "জ্ঞ" বা বিজ্ঞাতা পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, অপর দিকে "অজ্ঞ" অথচ বিজ্ঞাত প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বোধ ও জ্ঞানের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। "মহৎ" শব্দের অর্থও জ্ঞান। এই মহৎ বা জ্ঞান যে, "অজ্ঞ" পদার্থ হইতে অভিব্যক্ত হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভব? এক যদি "জ্ঞ" পদার্থের অস্তিত্ব একবারে অস্বীকার কর,

তাহা বুঝা যায়; চার্ব্বাকেরা বলে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থ স্বভাবতঃ অজ্ঞ, অর্থাৎ পরস্পর স্বতন্ত্র অবিযুক্ত অবস্থায় অজ্ঞ, তত্রাচ মিশ্রিত হইলে তাহা হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে। এই মত সত্য হউক না হউক, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু জ্ঞানকে অজ্ঞ অচেতন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া ধরিলে আর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়।

অর্ব্বাচীন সাংখ্যেরা দুইপ্রকার জ্ঞানের কথা বলেন; কেবল জ্ঞান ও বিকৃত জ্ঞান। যত দূর বুঝা যায়, তাহাতে তাঁহাদের এইরূপ মত বোধ হয় যে, কেবল-জ্ঞানই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান। কেবল জ্ঞানে অহঙ্কারের সত্তা নাই; "নাস্মি ন মে নাহমিতি কেবল-মুৎপদ্যতে জ্ঞানং"—অর্থাৎ আত্মা যখন প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন বলিয়া পরিগ্রহ করে, তখন (অর্ব্বাচীন সাংখ্যেরা বলেন) আমি বিদ্যমান নহি, আমার নহে, আমি নয়, এইরূপ আকারের একপ্রকার জ্ঞান জন্মে। ইহাকেই কেহ কেহ কৈবল্য অর্থাৎ কেবল জ্ঞানের অবস্থা বা মোক্ষ বলেন; বোধ হয়, ইহাকেই বৌদ্ধেরা পরে নির্ব্বাণ বলিয়া গ্রহণ করেন। তাহাতে কেবল

জ্ঞান ও বিকৃত জ্ঞানের এইরূপ প্রভেদ দেখা যায়— একটি অহঙ্কার-সংযুক্ত, অপরটি অহঙ্কারবিযুক্ত। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে আদিম সাংখ্যাচার্য্যগণের "মহৎ" নামক জ্ঞানকে কেবল জ্ঞান বলিবে, না বিকৃত জ্ঞান বলিবে? তাহাতেও ত অহঙ্কারের লেশ নাই? ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, কেবল ও বিকৃত জ্ঞানের ভেদ কপিলসম্মত ও অনুমোদিত নহে; ইহা পরবর্ত্তী সাংখ্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সাংখ্য বিজ্ঞানে প্রক্ষিপ্ত।

যদি এই ভেদ স্বীকার করা না যায়, জ্ঞানমাত্রই মূলে একজাতীয় পদার্থ বলিয়া ধরা যায়, এবং যদি "জ্ঞ" নামক স্বতন্ত্র স্বাধীন নিত্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলা যায় না। আমার বিবেচনায় প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যদের মতে "মহৎ" প্রভৃতি প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ জন্য পুরুষ হইতে আবির্ভূত জ্ঞান; প্রকৃতি হইতে নহে। সংসারের সৃষ্টি (অর্থাৎ দার্শনিক সৃষ্টি) প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ-বশতঃ, পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়াবশতঃ, আবির্ভূত হইয়া থাকে।

ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ, এই তিনের মধ্যে, অব্যক্ত ও জ্ঞ

নিত্য পদার্থ, ব্যক্ত অনিত্য ও জন্য পদার্থ। এই অনিত্য পদার্থ, যাহাকে সাধারণতঃ জগৎ বা সংসার বলিয়া লোকে পরিগ্রহ করে, তাহা অপর দুই নিত্যপদার্থের এক আশ্চর্য্য সম্পর্কবশাৎ, তাহার মধ্যে একটি (জ্ঞ) হইতে অভিব্যক্ত হয়, ইহাই সমীচীন সাংখ্যমত। ব্যক্ত সম্পূর্ণ জ্ঞানময়; অব্যক্ত সেই জ্ঞানের চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া আমাদের প্রতীতির বিষয় হয়; কিন্তু তত্তৎ প্রকার জ্ঞানোৎপাদক ব্যতিরেকে, স্বরূপতঃ তাহা কি, তাহা চিরকাল আমাদের নিকট অব্যক্ত থাকিয়া যায়।

১২ ॥ মনুসংহিতার সৃষ্টি ও সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি ॥

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বৈদিক বা পৌরাণিক "সৃষ্টি"র সহিত দার্শনিক "সৃষ্টি"র কোন সম্বন্ধ নাই, আমরা ইতস্ততঃ যে সকল পদার্থকে দেখিতেছি, শুনিতেছি, আস্বাদ করিতেছি, আঘ্রাণ করিতেছি, স্পর্শ করিতেছি বলিয়া অনুভব করি, সেই সকল পদার্থ ক্রমশঃ কি প্রকারে, কি পর্য্যায়ে আমাদের বোধ বা জ্ঞান হইতে আবির্ভূত বা অভিব্যক্ত হয়, কিরূপে আমাদেরই জ্ঞান বাহ্যপদার্থ বা স্থূলভূত হইয়া দাঁড়ায়, তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি। এই সৃষ্টির অভিনয় প্রত্যেক নরনারীর দ্বারা অহরহ নির্ব্বাহ হইতেছে। ইহাতে ঈশ্বরের হস্ত কিছুই দেখা যায় না। ইহা তর্কের দ্বারা প্রমাণ করা যায়, বিচার করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই মত অনুসারে তোমার জগৎ তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, আমার জগৎ আমি সৃষ্টি করিয়াছি। প্রত্যেক মনুষ্যের সৃষ্টিক্রিয়া তাহার জীবনের সহিত আরব্ধ হয়, তাহার মৃত্যুর সহিত শেষ হয়। মনুষ্যজীবনের পূর্ব্বের কোনও ঘটনার সহিত এই সৃষ্টিব্যাপারের কোনও সম্পর্ক

নাই। পক্ষান্তরে, যাহাকে বৈদিক বা পৌরাণিক সৃষ্টি বলা যায়, তাহা মনুষ্যজীবনের পূর্ব্বের ঘটনা বিশেষ। দর্শনশাস্ত্রে যে পদার্থশ্রেণীকে “অব্যক্ত” বা “প্রকৃতি” বলা যায়, সেই স্বাধীন সত্তাবান পদার্থসকল কিরূপে উৎপন্ন হইল, অথবা কিরূপে তাহারা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল- তাহাদিগকে উৎপন্ন করিবার অথবা বর্ত্তমান আকার প্রদান করিবার হেতু বা অভিপ্রায় কি—এই সকল কথার আন্দোলন বা মীমাংসার নাম বৈদিক বা পৌরাণিক সৃষ্টি। এই দুইটি বিষয় এতই স্বতন্ত্র যে, উভয়কেই সৃষ্টি বলাতে বিষম গোলযোগের সম্ভাবনা; শুদ্ধ সম্ভাবনা কেন, বিষম গোলযোগই দাঁড়াইয়াছে। অনেকেই সাংখ্যসৃষ্টিকে বৈদিক সৃষ্টির সহিত অভিন্ন জ্ঞান করেন। তাহা যে বিষম ভ্রম, তাহা সাংখ্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া আলোচনা করিলে আর সন্দেহ থাকে না। আদি সৃষ্টি বোধ, বোধ হইতে সূক্ষ্ম বা জ্ঞানময় রূপরসাদির পৃথক জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়শক্তির অনুভব, তাদৃশ জ্ঞান ও অনুভব হইতে স্থূল বা বাহ্য রূপরসাদির আবির্ভাব, এ সমুদায়ই তোমার, আমার ও প্রত্যেক মনুষ্যের আধ্যাত্মিক ব্যাপার ও প্রক্রিয়া। ইহাকে সৃষ্টি নাম না দিয়া একটি অপর

নাম দিলে ভাল হয়। আমি প্রস্তাব করি, অতঃপর ইহাকে "ব্যঞ্জনা" বলা হউক। সংসারের "সৃষ্টি", আর সংসারের "ব্যঞ্জনা"; অর্থাৎ ঈশ্বর সংসারকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অব্যক্ত। মনুষ্য স্বীয় বোধের দ্বারা সেই অব্যক্ত সংসারের "ব্যঞ্জনা" সাধন করে, তখন তাহা "ব্যক্ত" এই নামে অভিধেয়। এতাবতা সংসার বা জগৎ দ্বিবিধ, "অব্যক্ত" ও "ব্যক্ত"। যাহা অব্যক্ত, তাহা নিত্য, যাহা ব্যক্ত, তাহা ক্ষণিক। সেই নিত্য অব্যক্ত সংসারকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, এবং ব্যক্ত সংসার সেই অব্যক্তের জ্ঞান হইতে আবির্ভূত হয়; তাহাকে মনুষ্য ব্যঞ্জনা করে। ঈশ্বর প্রাকৃতিক পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা; মনুষ্য স্থূলভূতের "ব্যঞ্জন"-কর্ত্তা।

ফলতঃ, ঈশ্বর প্রাকৃতিক পদার্থসকল কিরূপে কেন সৃষ্টি করিলেন, ইহা সাংখ্যদর্শনের আলোচ্য বিষয় নহে। এমন কি সাংখ্যেরা বলেন, দর্শনশাস্ত্রের প্রমাণে তাদৃশ সৃষ্টিকর্ত্তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এখানে মনুসংহিতার সৃষ্টির কথা কেন উঠে? তাহার কারণ এই যে, মনুসংহিতা-লেখক হয় সাংখ্যের সৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, না হয় সাংখ্যের

পরিভাষা অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতিক পদার্থের সৃষ্টিবর্ণনা করিতে গিয়া একটি মহা গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। উপরি-উল্লিখিত সৃষ্টি ও ব্যঞ্জনার ভেদ না বুঝিলে কি গোলযোগ ঘটে, মনুর সৃষ্টির কথাতে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

মনুসংহিতা-লেখক লেখেন,—

"আসীদিদং তমোভূতম্
অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যম্ অবিজ্ঞেয়ং
প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥"

ভাষ্যকারেরা বলেন যে, অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত প্রকৃতির নাম "তমস্"। যদি মূলের কোনও অর্থ থাকে, তবে তাহা এই যে, একদা প্রকৃতি নামক পদার্থপুঞ্জের সহিত পুরুষ নামক পদার্থের কোনও প্রকার সম্পর্ক ছিল না। তদানীং পুরুষের সহিত প্রকৃতির জ্ঞ-জ্ঞেয় সম্বন্ধ ছিল না—সুতরাং এই তমোভূত (অব্যক্ত অবস্থাপন্ন) সংসার পুরুষ কর্ত্তৃক অপ্রজ্ঞাত ছিল; কাজে কাজেই ইহার কোন লক্ষণ ছিল না। কেবল যে অপ্রজ্ঞাত ছিল, তাহাই নহে, ইহা একবারে অবিজ্ঞেয় ছিল।

পুরুষেরা যে ইহাকে জানিতে পারিবে, তাহার কোনও উপায় ছিল না। অপিচ ইহা অপ্রতর্ক্য ছিল, পুরুষেরা তর্ক করিয়াও ইহার অস্তিত্বনিরূপণে অক্ষম ছিল। এ পর্য্যন্ত একরকম বুঝা যায়। তাহার পর একটি রূপক—"ইহা যেন চারি দিকে নিদ্রিতের ন্যায় ছিল।" চেতন পদার্থ ই নিদ্রা যায়; অচেতন প্রকৃতি কিরূপে নিদ্রিতের ন্যায় থাকিবে, তাহা বুঝা দুষ্কর। লেখকের বোধ হয় অভিপ্রায় এই যে, তদানীং প্রকৃতির কোনও প্রকার ক্রিয়া থাকিলেও তাহা না থাকার মত ছিল, কেন না, তাহা জ্ঞানের অতীত ছিল। অতএব সেকালে প্রকৃতিকে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট বা নিদ্রিত থাকার মত ধরিয়া লওয়া যায়। তাহার পর লেখন,——

"ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্
অব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ
প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥"

সাংখ্যদর্শনে অব্যক্ত শব্দ পারিভাষিকরূপে "প্রকৃতি" অর্থ প্রকাশ করে। এখানে তাহা ঈশ্বরের বিশেষণ।*

* আমার সন্দেহ হয়, এ স্থলে প্রকৃত পাঠ "অব্যক্তো" না হইয়া "অব্যক্তং" হইবে।

অর্থ এই—মহাভূত বা স্থূলভূতাদি (বাহ্যরূপাদি) বৃত্ত বা ঘটনা যাঁহার শক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, সেই ভগবান্ অব্যক্ত প্রকৃতিকে ব্যক্ত করিয়া প্রকৃতির "তমস্" (অব্যক্ত) অবস্থা অপসারিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। এ স্থলে অর্থের বড়ই গোলযোগ। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ অব্যক্তের ব্যঞ্জনা করে। কিরূপে করে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার বুঝা যায়। কিন্তু ঈশ্বর অব্যক্তকে কিরূপে ব্যঞ্জনা করিবেন, তাহা বুঝা দুষ্কর। যদি ঈশ্বর স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা ঐ কার্য্য সাধন করিলেন বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের জ্ঞানের আদি স্বীকার করিতে হয়—সে বড় বিষম কথা !

তবে যদি এমন অর্থ হয় যে, ঈশ্বর পুরুষের সহিত প্রকৃতির জ্ঞ-জ্ঞেয় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়া অব্যক্তের ব্যঞ্জনা সাধন করিলেন, তাঁহারই শক্তিবশাৎ প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগসাধন হইলে মহৎ হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইল, তাহা হইলে অর্থ পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু মূলে এরূপ ভাব পরিষ্কার নহে।

ফলতঃ, মনুসংহিতা-লেখক নয় সাংখ্য, নয় বেদান্তী। কেন না, তিনি পরক্ষণেই আবার বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি

ও ঈশ্বর অভিন্ন ! ! ! ঈশ্বর চিন্তা করিয়া স্বীয় শরীর হইতে সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিলেন। একবার বলেন, আপন শরীর হইতে অপ্ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে এক সুবর্ণের অণ্ড উৎপন্ন হইল ; আবার বলেন, ঈশ্বর মহৎ, অহঙ্কারাদি সৃষ্টি করিলেন ! আমাদের শাস্ত্রে সাংখ্য বেদান্ত লইয়া এইরূপই খিচুড়ী পাকানো হইয়াছে।

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ কি ? সাংখ্যেরা বলেন, অদৃষ্ট। এই কথা লইয়া আবার এক গোলযোগ। অবিবেচক লোকে বুঝিল, তবে "অদৃষ্ট" বুঝি না জানি কি একটা শক্তি বা দেবতা। ভাষা কথায় "অদৃষ্ট" এই হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা যে কার্য্যের দর্শনশাস্ত্র-সম্মত কারণ নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম, তাহাকে বলেন অদৃষ্টের কার্য্য, এবং সেই কারণকে বলেন অদৃষ্ট। ইহা তাঁহারা শক্তি-বিশেষ বা দৈব-বিশেষ বলিয়া ভাবেন না। কিন্তু মূর্খলোকে অদৃষ্ট শব্দ দৈব নিশ্চয় করিয়া লইয়াছে। সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না, বেদান্তীরা তাঁহাদিগকে বলেন, "তোমরা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ স্বীকার কর, কিন্তু সেই সংযোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার না ;

সেই কারণকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর না কেন ?” সাংখ্যেরা বলেন—“যাহা জানি না, তাহা ঈশ্বর বলিব কিরূপে ? আমরা এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি সে কারণ আমাদের দর্শনশাস্ত্রের অনির্দ্দেশ্য। আমরা তাহা অদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না।”

ফলতঃ দর্শনশাস্ত্রের সীমা ছাড়াইয়া গিয়া প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণকে যদি ঈশ্বরই বলা যায়, তবে সেই সংযোগকেই বা সৃষ্টি বলা যায় কিরূপে ? সেইরূপ সংযোগ ত অহর্নিশ অশেষবার সম্পন্ন হইতেছে। প্রত্যেক নরনারীর জন্মে সেই ঘটনা ঘটিতেছে। তাহাকে সংসারের সৃষ্টি বলা যায় না। তাহাকে বরং মনুষ্যসৃষ্টি বলা যায়। সাংখ্যপরিভাষা অবলম্বন করিয়া সৃষ্টিব্যাপার লিখিতে গিয়া মনুসংহিতা-লেখক কি বিপদে পড়িয়াছেন, এক্ষণে পাঠকবৃন্দ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মহৎ অহঙ্কারাদির অভিব্যক্তিকে অতঃপর আর কেহ যেন সংসারসৃষ্টির বিবরণ বলিয়া পরিগ্রহ না করেন।

১৩ ॥ যুক্তির মর্য্যাদা ॥

সাংখ্যদর্শন যদি আর কিসের জন্যও না হয়, তত্রাচ এই শাস্ত্রে যুক্তির যেরূপ মর্য্যাদা, তজ্জন্য ইহা আমাদের আদরণীয়। যুক্তি এবং বিচারশক্তিকেই আমাদের হৃদয়ের আধিপত্য প্রদান করা উচিত। যাহা অযৌক্তিক, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ—তাহা কোনও মতেই আমাদের গ্রহণীয় হওয়া উচিত নহে। বেদ পুরাণ স্মৃতিতেও যদি অযৌক্তিক কথা বলে, তাহা অগ্রাহ্য। সাংখ্যেরা বলেন ;—

"বাধিতমর্থং বেদোঽপি ন বোধয়তি—"

—অর্থাৎ যাহা যুক্তি এবং বিচারে বাধে, বেদও তাহা বুঝাইতে অক্ষম—তাহা বাঙ্‌মাত্র। এ বিষয়ে সাংখ্যাচার্য্য কপিলের উপদেশ এইরূপ ;—

"অনিয়তত্বেঽপি ন অযৌক্তিকস্য সংগ্রহঃ,
অন্যথা বালোন্মত্তাদিসমত্বম্" ॥ ১।১।২৬

—যেখানে কোনও নিয়ম আবিষ্কার করা যায় না, এমন কি সেখানেও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা গ্রাহ্য নহে ; কেন

না, যুক্তিবিরুদ্ধ কথা অঙ্গীকার করিলে আমরা বালক ও উন্মত্তের সমশ্রেণীভুক্ত হইব!—পৃথিবীতে সকল বিষয়ই নিয়মের অধীন; কোনও বিষয়কে নিয়মের অন্তর্ভূর্ত দেখিলেই আমরা তাহা বুঝিলাম বলিয়া স্থির করি। কিন্তু অনেক বিষয় আছে, যাহার নিয়ম আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাহা আমাদের চক্ষে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। গুরুদ্রব্য নীচের দিকে পড়ে—প্রাচীনেরা এই এক নিয়ম দর্শনসিদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন। এই নিয়ম অনুসারে পৃথিবী গুরু হইলেও ক্রমাগত নীচের দিকে পড়িয়া যায় না কেন—প্রাচীনদের মধ্যে এই একটা মস্ত বিতর্কের বিষয় ছিল। এখানে নিয়মের অভাব দেখিয়া অজ্ঞলোকে কল্পনা করিল, একটা বৃহৎ কচ্ছপের পৃষ্ঠে আমাদের ধরণী অবস্থিত! এই সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা যাহারা অঙ্গীকার করে কপিলের মতে তাহারা বালক অথবা উন্মত্ত। যেখানে কোনও একটা বিষয় বুঝিতে পারিবে না, সেখানে আপাততঃ বুদ্ধি পৌঁছিল না বলিয়া স্বীকার করিবে, এবং তাহার নিয়ম-আবিষ্কারের জন্য যত্নবান হইবে;—কেহ বিষয়টাকে এ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিতে পারে নাই বলিয়া একটা যথাতথা যুক্তিবিরুদ্ধ

ব্যাখ্যা কদাচ অঙ্গীকার করিবে না। কপিলের এই উপদেশ আমাদের মজ্জাগত হওয়া উচিত।

যজ্ঞে বা দেবপূজায় পশুহত্যা করিয়া অনেকে স্বর্গে যাইব মনে করে। মনুষ্য পৃথিবীতে দুঃখের যন্ত্রণায় দুঃখবর্জ্জিত স্বর্গের কল্পনা করে। এবং জীবহত্যারূপ যন্ত্রণাকে কেহ কেহ স্বর্গসুখের কারণ বিবেচনা করে। এই এক অযৌক্তিক কথার প্রতি কটাক্ষ করিয়া সাংখ্যেরা বলেন ;—

"দুঃখাৎ দুঃখম্—জলাভিষেকাৎ ন জাড্যবিমোকঃ"—

—শীতার্ত্ত ব্যক্তি জলমগ্ন হইলে তাহার যে দশা, পশুঘাতী যজমানেরও সেই দশা—কেন না, দুঃখ হইতে দুঃখই হইতে পারে। সুখ হইতে পারে না।

কথাটা কিছু রঙ্গিন বলিয়াই এ স্থলে উল্লেখ করিলাম। ইহার মধ্যে যুক্তি এই ;—কারণের গুণে কার্য্যের গুণ গঠিত হয়। পশুহত্যা যদি স্বর্গের কারণ হয়, তবে পশুহত্যা যখন যন্ত্রণার কারণ, স্বর্গও তখন যন্ত্রণার কারণ হইবে। কারণে দুঃখ থাকিলে কার্য্যেও দুঃখ থাকিবে।

বলা বাহুল্য, যুক্তিটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। দুঃখ হইতে সুখের উৎপত্তি যে দেখা যায় না, এমন নহে।

আমরা ঈশ্বরোপাসনায় পশুহত্যার পক্ষপাতী নহি—সে ভিন্নকারণে। এ স্থলে কথাটার অবতারণা এই জন্য করা হইল যে, প্রাচীন সাংখ্যেরা যুক্তির মর্য্যাদারক্ষা জন্য বেদোক্ত আচারকেও দূষণীয় বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

১৪॥ আত্মা ও দীপশিখা॥

নাস্তিকমতে "আত্মা" নামে স্থির বা নিত্যপদার্থ নাই। তাঁহাদের মত,—

"স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম্" ॥ ১।১।৩৪

—সকল কার্য্যই অস্থির, বা অনিত্য—আত্মা একপ্রকার কার্য্য, যেমন দীপশিখা;—অতএব আত্মাও ক্ষণিক। উদাহরণটি নাস্তিকদের বড় প্রিয়। যেমন তৈল ও বর্ত্তিকাতে অন্য দীপশিখার যোগে একটি নূতন দীপশিখার আবির্ভাব হয়, তেমনি শুক্রশোণিতে অন্ত আত্মার যোগে নূতন আত্মার আবির্ভাব হয়। দীপশিখাকে তোমরা মনে কর উহা স্থির; বাস্তবিক তাহা নহে; উহা ক্ষণে ক্ষণে নবীকৃত হইতেছে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে দীপশিখা নূতন হইতেছে; উহা ক্ষণিক; কেবল স্থির বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। দীপশিখার ধারাবাহিকতাবশতঃ উহা স্থির বলিয়া মনে হয়—তেমনি জ্ঞানপ্রবাহের ধারাবাহিকতাবশতঃ একটা স্থির আত্মা আছে বলিয়া মনে হয়। সেটা অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রান্তদর্শনমাত্র।

সাংখ্যেরা এই মত খণ্ডনের জন্য বিস্তর যত্ন করিয়া-

ছেন। নিম্নে তাঁহাদের যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। উল্লিখিত "স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ" সূত্রের উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন—

"ন,—প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ" ॥ ১ । ১ । ৩৫

—সকল কার্য্যই অস্থির, এ কথা আমরা স্বীকার করি না, তাহা হইলে "প্রত্যভিজ্ঞা"—পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা এখন স্পর্শ করিতেছি, এইরূপ জ্ঞান (Identification) অসম্ভব হইত। এক মুহূর্ত্তে যে ঘটকে দেখিয়াছি, পরমুহূর্ত্তে আর সে ঘট যদি না থাকে—তবে সেই ঘটকে দেখিতেছি বলিয়া জ্ঞান হয় কেন ?

যদি বল, তাহা ভ্রমজ্ঞান, তাহা হইলে অন্য আপত্তি আছে,—

"দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ" । ১ । ১ । ৩৭

—তোমাদের দীপশিখার দৃষ্টান্ত খাটে না। অগ্রে তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে, যে, দীপশিখা যেমন তৈল বর্ত্তিকা প্রভৃতি কারণের কার্য্য, তেমনি আত্মাও কোনও কারণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। আত্মাকে কার্য্য বলিয়া কেন স্বীকার করিয়া লইব ?

আরো আপত্তির কারণ এই যে, তোমরা যে কার্য্যকারণভাব অঙ্গীকার কর, তাহা বস্তুমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব মানিলে অসঙ্গত হয়। কেন না,—

"যুগপজ্জায়মানয়োঃ ন কার্য্যকারণভাবঃ" ॥—১।১।৩৮

—তুইটি বস্তু যদি যুগপৎ উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব থাকিতে পারে না। কারণ হইতে যখন কার্য্যের উৎপত্তি, তখন কারণকে কার্য্যের প্রাক্‌ক্ষণবর্ত্তী হইতে হইবে। আর যদি বস্তুমাত্রেই ক্ষণধ্বংসী হয়, তবে—

"পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ" ॥ ১।১।৩৯

—পূর্ব্বকালবর্ত্তী কারণ ধ্বংস হইলে উত্তরকালবর্ত্তী কার্য্য অসম্ভব হয়। অপিচ কারণস্বরূপ উপাদান ও কার্য্যস্বরূপ উপাদেয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক যে, যখন উপাদেয় আছে,—যখন উপাদান নাই, তখন উপাদেয়ও নাই। সুতরাং

"তদভাবে তদযোগাৎ উভয়ব্যভিচারাদপি ন" ॥—১।১।৪০

—বস্তুর ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিলে কারণের সদ্ভাবে কার্য্যের সদ্ভাব ঘটে না—উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধকালবর্ত্তিত্ব-রূপ ব্যভিচার ঘটে।

যদি বল, কারণ কেবল কার্য্যের প্রাক্‌ক্ষণে বর্ত্তমান থাকিয়াই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়,—নিয়ত প্রাক্‌ক্ষণবর্ত্তিত্বই কারণত্ব—উত্তর—

"পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ" ॥ ১। ১। ৪১

—কেবল নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব অঙ্গীকার করিলে উপাদান ও নিমিত্তকারণের প্রভেদের কোন নিয়ম থাকে না। আর তর্কস্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে—অভাবই সকল কার্য্যের কারণ—কেন না, সকল কার্য্যেরই আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাহার অভাব দেখা যায়। যদি নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেই কারণ হইল, তবে অভাব ত সকল কার্য্যেরই পূর্ব্ববর্ত্তী ?—

যদি বল—না হয় আত্মাকে কার্য্যই না বলিলাম —কার্য্যকারণের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্, কিন্তু আমরা "বিজ্ঞানবাহ্য" অর্থাৎ বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তুর সত্তা অঙ্গীকার করি না ; আত্মা কেবল বিজ্ঞান-প্রবাহমাত্র ;—তাহার উত্তর এই যে,—

"ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ ॥ ১। ১। ৪২।

—বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই, এ কথা কিরূপে অঙ্গীকার করা যায়—কেন না, বিজ্ঞানবাহ্য বা বিজ্ঞান-

ব্যতিরিক্ত বস্তুর "প্রতীতি"— অর্থাৎ সাক্ষাৎকার নামক অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে। সকলেই বিজ্ঞান-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদতিরিক্ত "জ্ঞ" ও "বিজ্ঞাত" বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থের সাক্ষাৎকার অনুভব করেন। যদি বল তাহা ভ্রম—

"তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি"। ১।১।৪৩

—তাহা হইলে প্রতীতিসত্ত্বেও বিজ্ঞানবাহ্য-পদার্থের অঙ্গীকার না করিলে বিজ্ঞানেরও অভাব হয়, সংসার সম্পূর্ণ শূন্য হয়। কেন না,

"প্রতীতির্হি বিষয়সাধিকা"—

—প্রতীতির প্রমাণে বিজ্ঞানবাহ্য পদার্থ অঙ্গীকার না করিলে, প্রতীতির প্রমাণে বিজ্ঞানকেই বা অঙ্গীকার কেমনে কর?

উপসংহারে বক্তব্য এই, যাঁহারা বলেন—

"শূন্যং তত্ত্বং"—১।১।৪৪

—না হয় শূন্যকেই তত্ত্ব বা সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিলাম—ক্ষতি কি?—সে কেবল

"অপবাদমাত্রমবুদ্ধানাং"॥ ১।১।৪৫

—সে কেবল মূর্খলোকের একটা অসার কথামাত্র।

"উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি" ॥ ১ । ১ । ৪৬

—বস্তুমাত্রেই ক্ষণিক—বিজ্ঞান ভিন্ন কিছু নাই, এই উভয় পক্ষ প্রত্যভিজ্ঞান ও প্রতীতি দ্বারা যেমন খণ্ডন হয়, এই অসার মতও তাদৃশ খণ্ডনীয়।

অপুরুষার্থমুভয়থা ॥ ১ । ১ । ৪৭

সংসার শূন্য বলিলে তোমার দুঃখনিবৃত্তিও হইবে না—দুঃখনিবৃত্তির কোনও উপায়ও উদ্ভাবিত হইবে না। এ কথার তর্কে কালহরণ নিষ্ফল।

শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে উপরি-উক্ত প্রকার আন্দোলন চলিতেছিল। দেখা যায়, এক সম্প্রদায় তার্কিক আত্মাকে দীপশিখার ন্যায় জড়পদার্থের ক্ষণস্থায়ী কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন—আর এক সম্প্রদায় আত্মাকে কেবল বিজ্ঞানপ্রবাহমাত্র বলিয়া খ্যাপন করেন। কপিল এই উভয় মতই কেবল যুক্তির আশ্রয়ে ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান হয়েন। তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তাশীল পাঠকবৃন্দের নিজ নিজ বিবেচনাসাপেক্ষ। দেখা যায়, তিনি "প্রতীতি" ও "প্রত্যভিজ্ঞানে"র ভিত্তির উপর আত্মার স্বাধীন অস্তিত্বের

প্রখ্যাপক শাস্ত্র গঠন করেন। কিন্তু তাঁহার অনুচরেরা কেহ কেহ অনুমানের দ্বারা আত্মার অস্তিত্বস্থাপনের যত্ন করেন। প্রতীতি এবং প্রত্যভিজ্ঞানের দ্বারা যেমন এক দিকে বিজ্ঞানধর্ম্মী আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তেমনি অপর দিকে অজ্ঞ জড়ের অস্তিত্বও প্রমাণ হয়। কপিলের মতে বিজ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছিলে প্রতীতি হয় যে,

"জড়প্রকাশযোগাৎ প্রকাশঃ"। ১। ১। ১৪৫

—প্রকাশ, অর্থাৎ বিজ্ঞানের স্ফূর্ত্তিতে প্রকাশাত্মক আত্মা এবং অপ্রকাশাত্মক জড়ের সংযোগ সাধিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাই দর্শনশাস্ত্রের প্রথম সোপান। ইহার উপর আর তর্ক চালাইবার অবসর নাই। ইহার অপলাপ করিলে সংসারকে শূন্য বলিয়া গণ্য করিতে হয় —এবং যাহারা সংসারকে শূন্য বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা বাতুল। আর ইহার অপরদিকে দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টি চলে না—সমুদায়ই "অদৃষ্ট"। সেখানেও তর্ক চালাইতে যাওয়া বিফল।

১৫॥ অদ্বৈতবাদ॥

যাঁহারা বলেন, সংসারে একমাত্র আত্মা আছে—দ্বিতীয় নাই—সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং"—বাদিগণকে সাংখ্যেরা বলেন,—

"জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্" ॥ ১। ১। ১৪৯

—দেখ, জন্ম ও মরণের একটা নিয়ম আছে; যদি আত্মা অদ্বিতীয় হয়, তবে এক আত্মার জন্মে * সবাই জন্ম অনুভব করে না কেন? যদি বল,—

উপাধিভেদেহপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ ॥১।১।১৫০

উপাধিভেদবশতঃ এক আত্মা বহু বলিয়া প্রতীয়মান

---

* পিতা মাতা হইতে পুত্রের উৎপত্তিতে আমরা আত্মা হইতে আত্মার উদ্ভব দেখি। সেইখানেই আবার আত্মার সহিত আত্মার মিলনও দেখি। দুই আত্মার মিলনে নূতন আত্মার উদ্ভব। ফলতঃ এখানে আত্মার আংশিক মিলন, কেন না পিতা মাতার আত্মা ধ্বংস না হইয়া নূতন আত্মা জন্মিল। এরূপ স্থলে আত্মাকে অভিন্ন একমাত্র পদার্থ বলা যায়। মনে কর, যেমন জড়ের পরমাণু আছে, তেমনি আত্মার "শলাকা" আছে। দেহ = পুঞ্জীকৃত পরমাণু, আত্মা = তাড়িবাঁধা শলাকা। আত্মার শলাকা না বলিয়া "চৈতন্যের ধারা" বল।

হয়—যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটস্থ ও পটস্থ বলিয়া মনে হয় ; উত্তর এই যে,

"উপাধির্ভিদ্যতে নতু তদ্বান্" ॥ ১৫১

—তোমাদের মতে উপাধির ভেদ স্বীকার্য্য, উপাধিমান আত্মার ভেদ স্বীকার্য্য নহে। তাহা হইলে জন্মমরণের কথা ছাড়িয়া সুখদুঃখের কথা কি ? সুখদুঃখ আর কিছু উপাধির নহে। এক আত্মা সুখ অনুভব করিলে সর্ব্বোপাধিতেই সুখানুভব হয় না কেন—এক আত্মা দুঃখ অনুভব করিলে সর্ব্বোপাধিতেই দুঃখানুভব হয় না কেন ? আত্মার একাংশ "বদ্ধ" আর অপর অংশ "মুক্ত" (১) বলিলে গাঁজাখুরি হয় না কি ?

"এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ" ॥ ১। ১। ১৫২

—এইরূপে সর্ব্বোপাধিতে এক অভিন্ন আত্মা হইলে তাহাতে কি বিরুদ্ধধর্ম্মের আরোপ করা হয় না ?—আত্মাকে যদি স্বভাবতঃ বদ্ধ না বলা যায়, যদি উপাধি-যোগই আত্মার বদ্ধ ভাবের কারণ হয়—তাহা হইলেও আত্মার একদেশে বদ্ধভাব, অপরদেশে মুক্তভাব কিরূপে হইবে ? আর আত্মা তোমাদের মতেও নিত্যমুক্ত বটে

(১) বদ্ধ = দুঃখজড়িত ; মুক্ত = দুঃখপরিশূন্য।

—তাহা হইলে একাংশ মুক্ত, অপর অংশ বদ্ধ কিরূপ কথা ? আত্মার বহুত্ব অঙ্গীকার করিলে এই দোষের পরিহার হয়।

সাংখ্যেরা আরো বলিতে পারিতেন যে, অদ্বৈতবাদ-মতে আত্মা ব্যতিরিক্ত আর কোনও বস্তু না থাকায় উপাধিরই বা ভেদ কিরূপ ? অভিন্ন আত্মা ব্যতিরেকে ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত উপাধি থাকিলে আত্মা-ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুরও স্বীকার করা হইল না কি ?

ফলতঃ অদ্বৈতবাদ মতটা যে মাথা-পদ-শূন্য, তাহা প্রতিপন্ন করিতে অধিক আয়াসের আবশ্যক করে না। অদ্বৈতবাদীরা যুক্তিতে কুলাইতে না পারিয়া শ্রুতিরই দোহাই দেন। কিন্তু তথায় তাঁহাদের অনুসরণ করা অনাবশ্যক, কেন না, সাংখ্যাচার্য্যদের মতে—

বাধিতমর্থং বেদোহপি ন বোধয়তি ॥

অর্ব্বাচীন সাংখ্যেরা পলায়মান অদ্বৈতবাদিগণের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া বেদের জঙ্গলেও প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং তথায় শঙ্করের সহিত তাঁহাদের লাঠালাঠি হইয়াছে। কিন্তু সে বাগ্‌যুদ্ধের কাহিনী স্বতন্ত্র। তাহা দর্শনশাস্ত্রের বিষয় নহে।

১৬॥ চৈতন্য ও জ্ঞান॥

সাংখ্যদর্শনে "চৈতন্য" ও "জ্ঞান" এই দুইটি শব্দেরই বহুল-পরিমাণে ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ কি—তাহা বড় পরিষ্কার নহে। তত্রাচ অনু-ধাবন করিয়া দেখিলে যেন ভেদ আছে বোধ হয়।

সাংখ্যেরা বলেন, আমরা নিজ নিজ দৃষ্টান্তে প্রকৃতি ও পুরুষকে পরস্পর সম্বন্ধবিশেষে সংযত দেখি; কিন্তু এই সম্বন্ধবিশেষ নিত্য নহে। ইহার উচ্ছেদ সম্ভব, এবং তাঁহাদের শাস্ত্রে তদুচ্ছেদের উপায় নির্ণীত হইয়াছে। যাহা কপিলসূত্র বলিয়া পরিগণিত, তাহার শেষ সূত্র এই যে,—

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ ।৬—৭০।

যেন-তেন-প্রকারেণ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগসম্বন্ধের উচ্ছেদসাধন করাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আত্মা প্রকৃতির সহিত অসংযত হইয়া থাকিতে সক্ষম। তদবস্থায় আত্মার স্বভাব কি? সাংখ্যেরা বলেন, "চৈতন্যই তদবস্থায় আত্মার স্বভাব।" আর সচরাচর যাহাকে

"জ্ঞান" বলা যায়—কোনও কোনও সাংখ্য পণ্ডিত তাহাকে এমন কি প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহাতে "জ্ঞান" প্রকৃতির কার্য্য হউক বা না হউক, অন্ততঃ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ জন্য বটে ; আর যাহা "চৈতন্য" বলিয়া অভিহিত, তাহা প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ জন্য নহে।

এই "চৈতন্য" নামক পদার্থ প্রকৃতিতে আদৌ নাই, তজ্জন্য প্রকৃতিকে "অচেতন" বলা যায়। কপিলের এক সূত্র এই,—

"ন ভূত 'চৈতন্যং' প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেঽপিচ।" ৫—১২৯।

—অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ নিযুক্ত হইয়াই থাকুক্ বা সংযুক্ত হইয়াই থাকুক্, তাহাতে "চৈতন্য" নাই। কেহ কেহ চৈতন্য ও জ্ঞানকে সমানার্থক বলিয়া বুঝেন। তবে উপরি-উক্ত ভেদজ্ঞাপনের জন্য "বিশুদ্ধ চৈতন্য" ও "বিকৃত চৈতন্য" এইরূপে চৈতন্যের ভিন্নাবস্থা স্বীকার করেন। তদ্রূপ জ্ঞানকে সাধারণ জ্ঞান ও কেবল জ্ঞান বা "কৈবল্য" বলিয়া বিভক্ত করেন। এইরূপ বিভাগ সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যদি জ্ঞান ও চৈতন্যের

বাস্তবিক ভেদ কিম্বা ভিন্নাবস্থা থাকে, তবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।

বোধ হয়, চৈতন্য ও জ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ করিলে, সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্ব স্পষ্টীকৃত হইতে পারে; যথা,—

(১) চৈতন্য=আত্মার স্বকীয় সত্ত্বা ও অবস্থার অনুভব॥

(২) জ্ঞান=ভৌতিক পদার্থ দ্বারা আত্মার অবস্থান্তর॥

চৈতন্য আত্মার নিত্যসহচর। চৈতন্য দ্বারা বিযুক্ত হইয়া আত্মা কোন কালেই থাকে না। চৈতন্যের লোপে আত্মার বিলোপ। আত্মা যেমন নিত্য, চৈতন্যও তেমনি নিত্য। চৈতন্য আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। আত্মা সকল সময়েই স্বকীয় সত্ত্বার ও অবস্থার অনুভব করিয়া থাকে। আমি আছি, আমার এক্ষণে অবস্থা এইরূপ—ঈদৃশ অনুভবকে চৈতন্য বলা যায়।

পক্ষান্তরে "জ্ঞান" আত্মার নিত্যসহচর নহে। সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞান থাকে না। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় অসংখ্য জ্ঞানের আবির্ভাব তিরোভাব হইতে থাকে। যখন জ্ঞান হয়, তখন আমার ঈদৃশ জ্ঞান হইতেছে বলিয়া

"চৈতন্য" থাকে ; আবার একপ্রকার জ্ঞান অন্তর্হিত হইলে ও ভিন্নপ্রকার জ্ঞান সমুদ্ভূত হইলে, সেই আবির্ভাব তিরোভাবেরও "চৈতন্য" হয়। অতএব "চৈতন্য" যেমন নিত্য, "জ্ঞান" তেমনি ক্ষণিক।

সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার চৈতন্য থাকে, ইহা সাংখ্যদের একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কথা। তাঁহারা বলেন,—

"সমাধি-সুষুপ্তি-মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা"। ৫—১১৬।

—আত্মা সমাধি অবস্থায়, সুষুপ্তি অবস্থায় এবং মোক্ষ অবস্থায় "ব্রহ্মত্ব" * প্রাপ্ত হয়। সমাধি অর্থাৎ ধ্যান ; ধ্যানের লক্ষণ ;—

"ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ"। ৬—২৫

—যে জাগ্রদবস্থায় মনের বিষয়স্বরূপ কোনও জ্ঞান থাকে না—তাহার নাম ধ্যান। আর যে অবস্থায় কোন কারণেই আত্মার কোনও প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয় না—তাহার নাম মোক্ষ।

* অর্থাৎ শরীরের অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ শরীরকে জীবিত রাখিয়াও তদ্দ্বারা অভিভূত হয় না।

মোক্ষ ও ধ্যান সম্ভব কি না, তাহা এ স্থলে বিবেচ্য নহে। পরে তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু সুষুপ্তি কি, তাহা আমরা সকলেই জানি। গভীর নিদ্রার নাম সুষুপ্তি। যে নিদ্রাবস্থায় কোনও প্রকার স্বপ্নদর্শন হয় না, তাহার নাম সুষুপ্তি। তৎকালে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ কিয়ৎকালের জন্য বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট না হইয়াও অবষ্টব্ধ ও অবরুদ্ধ হয়। প্রকৃতিপুরুষের কোনও অবস্থান্তরসাধন করে না; প্রকৃতি পুরুষের উপর ক্রিয়াকারিতা বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। আত্মা তৎকালে স্বীয় সত্তা ও অবস্থার যেরূপ অনুভব করে, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার কিছুমাত্র স্মৃতি থাকে না। কেন না, স্মৃতি একপ্রকার সক্রিয় প্রকৃতিসংযোগ জন্য জ্ঞান; সুতরাং প্রকৃতির বৃত্তিনিরোধ অবস্থায় চৈতন্যের স্মৃতি অসম্ভব। * সুষুপ্তির পর লোকে অনুভব করে—"আমি অতিসুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।"

* জাগ্রদবস্থার জ্ঞান স্মৃতির সত্তাবশতঃ অহঙ্কারসমন্বিত—সুষুপ্তি অবস্থায় চৈতন্যের স্মৃতি না থাকায় তাহাতে অহঙ্কারের লেশ থাকে না। তজ্জন্য সাংখ্যেরা 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অভিমানকে চৈতন্যের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন না।

ইহাতে যে নিদ্রাবস্থার কোনও প্রকার সুখের চৈতন্যের স্মৃতি হয়, তাহা বলা যায় না। ইহাতে কেবল দুঃখাভাব প্রকাশ করে। গভীর নিদ্রায় আমার সকল দুঃখজনক জ্ঞানের এবং সকল দুঃখের অবসান হইয়াছিল, ইহাই বক্তব্য। সুষুপ্তি অবস্থায় চৈতন্যকে জ্ঞানাভাব ও দুঃখাভাবের চৈতন্য বলা যায়; কিন্তু সেই চৈতন্য কোনও ভাবপদার্থের চৈতন্য কি না, তাহা নিশ্চয় করা যায় না। ফলতঃ, সুষুপ্তিতত্ত্বটি পণ্ডিতগণের সবিশেষ আলোচনার উপযুক্ত।

চৈতন্য থাকিলেও জ্ঞান থাকে না, দেখা গেল। কিন্তু চৈতন্য ব্যতিরেকে জ্ঞান অসম্ভব। জ্ঞানের ন্যায় সুখদুঃখও চৈতন্য ব্যতিরেকে অসম্ভব। যখন সুখ ও দুঃখের উদয় হয়—তখন আত্মা তত্তদবস্থাপন্ন হইল বলিয়া চৈতন্য বা অনুভব জন্মে। তাদৃশ অনুভব যখন অসম্ভব, তখন সুখ-দুঃখও অসম্ভব।

তদ্রূপ রাগদ্বেষাদি এবং ইচ্ছাশক্তির স্ফূর্তিসমকালেও তাহাদের মূলে আত্মার চৈতন্যের সদ্ভাব দেখা যায়।

চৈতন্যের আর এক নাম "বোধ"। চৈতন্য আত্মার

স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া সাংখ্যেরা আত্মাকে "ব্রহ্ম"
সংজ্ঞা প্রদান করেন। এবং আত্মাকে,—

নিত্যবুদ্ধস্বভাব

বা

নিত্যচৈতন্যময়

বলিয়া বর্ণনা করেন। কপিলসূত্র ১—১৯।

১৭ ॥ সুখ ও আনন্দ ॥

জ্ঞান ও চৈতন্যের যে প্রভেদ, সুখ ও আনন্দের মধ্যেও সেই প্রভেদ। যে সুখের বিচ্ছেদ নাই, তাহার নাম আনন্দ। তাহা অবিচ্ছিন্ন, সন্তত ও চিরাভ্যস্ত বলিয়া বিশেষ প্রণিধান ব্যতিরেকে অনুভূত হয় না। পক্ষান্তরে—প্রকৃতিসংযোগজন্য রূপরসাদির অনুভবে সুখের উৎপত্তি। সুখের আবির্ভাব তিরোভাব আছে। আনন্দ চৈতন্যের সহচর; তাহা নিত্য, তাহার আবির্ভাব তিরো-ভাব নাই। আত্মা যেমন স্বীয় অস্তিত্ব ও অবস্থা সর্ব্বদা অনুভব করে, তেমনি সেই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি বা মধুরভাবের অনুভব করে। আত্মার স্বীয় অস্তিত্বানুভব সর্ব্বদাই মধুরভাবময়; সেই মধুর-ভাবের নামই আনন্দ। যখন মৃত্যু বা আত্মার সম্ভাবিত বিনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখন সেই মধুরভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও মনুষ্য মরিতে চাহে না—কেন না, তৎকালেও স্বীয় সত্তা-নুভবের সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রবাহ বিদ্যমান, এবং মরিলে পাছে সেই অস্তিত্ব একেবারে দীপশিখার

ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, এবং তৎসহকৃত আনন্দের বিলোপ হয়—তজ্জন্যই মরণের ভয়। মরিলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে, এরূপ স্থির বিশ্বাস জন্মিলে মনুষ্যের মরণের ভয় ঘুচিয়া যায়। *

তজ্জন্য আত্মা যেমন চৈতন্যময় বা চিন্ময়—তদ্রূপ কেহ কেহ আত্মাকে "আনন্দময়" বলেন। কিন্তু এই মত সাংখ্যদর্শনসম্মত নহে। সাংখ্যেরা বলেন, আত্মা স্বভাবতঃ উদাসীন ;—সুখ দুঃখ যে কেবল আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে, তাহাই নয়—প্রকৃতিসংযোগেও আত্মা বাস্তবিক সুখদুঃখ অনুভব করে না—কেবল সুখদুঃখের ছায়ামাত্র আত্মায় নিপতিত হইয়া আত্মার সুখ ও দুঃখের ভ্রম জন্মায়। যেমন স্ফটিকের নিকট জবাকুসুম থাকিলে স্বচ্ছ স্ফটিকও লোহিত-বর্ণ দেখায়, তদ্রূপ প্রকৃতিগত সুখদুঃখের ছায়া আত্মাকে কিছুকালের জন্য রঞ্জিত করে মাত্র।

* পক্ষান্তরে যাহা সুখ ও দুঃখ, তাহা ভৌতিক পদার্থের ক্রিয়া-জনিত জ্ঞানের ফলাফল। আনন্দপ্রবাহ অখণ্ডিত ; কিন্তু সুখ-দুঃখ জ্ঞানের ন্যায় ক্ষণিক এবং আবির্ভাবতিরোভাবস্বভাব। জ্ঞান যেরূপ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগজন্য, সুখদুঃখও তদ্রূপ তাদৃশ সংযোগ-জন্য। উহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে।

ইহা ত গেল সুখদুঃখের কথা, তদ্ভিন্ন "আনন্দ"ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে—কেন না, (কপিল বলেন),—

"ন একস্য আনন্দচিদ্রূপত্বে ; দ্বয়োর্ভেদাৎ"। ৫—৬৩

টীকাকার বলেন,—

"একধর্ম্মিণঃ আনন্দচৈতন্যোভয়রূপত্বং ন ভবতি। দুঃখজ্ঞানকালে সুখাননুভবেন সুখজ্ঞানয়োর্ভেদাৎ ইত্যর্থঃ।"

ভিন্ন-ভিন্ন-ধর্ম্মযুক্ত একই আত্মা নামক পদার্থের "আনন্দ" ও "চৈতন্য" দ্বিবিধ ধর্ম্ম, এ কথা অঙ্গীকার করা যায় না। কেন না, দুঃখজ্ঞানকালে সুখের (১) অনুভব হয় না। অতএব যখন আনন্দের বিচ্ছেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন আনন্দকে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বলা যায় না; যে হেতু স্বাভাবিক ধর্ম্মের কখনই অপায় বা বিনাশ নাই।

এ স্থলে কোন্ মত আদরণীয় ও কোন্ মত উপেক্ষ-ণীয়, তাহা বিচক্ষণ পাঠকেরা মীমাংসা করিবেন। আত্ম-দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে ইহার মীমাংসা সম্ভব নহে। মীমাংসা-স্থলে প্রশ্ন এই,—দুঃখানুভবের সময়ে আনন্দানুভবের একেবারে অভাব হয় কি না? মীমাংসকের অনুভব যাদৃশ, তিনি তেমনি মীমাংসা করিবেন। সাংখ্যের বিরুদ্ধ

(১) এখানে "সুখ" ও "আনন্দের" ভেদ উপেক্ষিত হইয়াছে

পক্ষে বলা যায় যে, বিমিশ্রিত দুঃখ কেহই কোনকালে অনুভব করে না। সুখ ও আনন্দের ভেদ স্মরণ রাখিয়া বলা যাইতে পারে যে, ঘোরতর যন্ত্রণার মধ্যেও মনুষ্য আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এ কথা ঠিক কি না, তাহা অনুভব-সাপেক্ষ। যদি লেখকের অভিপ্রায় জানিতে পাঠকের কৌতূহল হয়,—তবে বলিতে পারি যে, এ স্থলে সাংখ্যের সহিত আমার মতের ঐক্য নাই। আমার বিবেচনায় জীবনের প্রশান্ত আনন্দপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন। আত্মা স্বীয় স্বাধীন সত্তার অনুভবকালে সর্ব্বদাই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। যাঁহারা আত্মাকে "সচ্চিদানন্দ" বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শিতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ফলতঃ, কপিলশিষ্যগণের অন্যান্য অনেক গুণ থাকিলেও—তাঁহারা যে সংসারকে বিষনয়নে দেখিতেন, এটি তাঁহাদের একটি দোষ না বলিয়া থাকা যায় না। সুখদুঃখময় সংসারে তাঁহারা সুখের প্রতি একবারে অবজ্ঞাপরবশ হইয়া দুঃখের প্রতীকারের জন্য যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন—সুখের উপচয়ের জন্য তাদৃশ যত্ন করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন,—

"যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষঃ।" ৬—৬

"কুত্রাপি কোঽপি সুখী ইতি।"৬ —৭

"তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ।" ৬—৮

অর্থাৎ—দুঃখ হইতে মনুষ্যের যেরূপ ক্লেশ সমুদ্ভূত হয়—সুখ হইতে ভোগবাঞ্ছা তাদৃশ সমুদ্ভূত হয় না। সংসারে লক্ষের মধ্যে একজনকে সুখী দেখিতে পাইবে। এবং সে স্থলেও সুখকে দুঃখমিশ্রিত দেখিবে। অতএব তাদৃশ দুঃখজড়িত সুখকেও বিবেচক লোকে দুঃখের পাল্লাতেই নিক্ষেপ করেন। এরূপ অবস্থায় সংসারে সুখ নাই বলিলেই হয়। যদি বল,—

"সুখলাভাভাবাৎ অপুরুষার্থত্বম্ ইতি চেৎ?"

—যদি তোমার শাস্ত্র-অনুশীলনে সুখোৎপত্তি না হয়, তবে তাহা নিরর্থক—

উত্তর—"ন—দ্বৈবিধ্যাৎ।"

তাহা বলিতে পার না—কেন না, মনুষ্য যেমন সুখ-লাভ ইচ্ছা করে, দুঃখবিনাশও তেমনি ইচ্ছা করে;—এই শাস্ত্র-অনুশীলনে যদি সুখলাভের আশা না থাকে, অন্ততঃ দুঃখনাশ হইবে। যদি কেবল দুঃখনাশের উপায়-উদ্ভাবনের জন্য জীবন উৎসর্গ না করিয়া সুখলাভ ও সুখবৃদ্ধির

উপায়-উদ্ভাবনের জন্যও কপিলশিষ্যেরা যত্নবান হইতেন —তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা সংসারের অধিকতর উপকার সংসাধিত হইতে পারিত। সাংখ্যশাস্ত্রের মোক্ষতত্ত্ব-আলোচনাকালে এই কথা পুনরায় আসিবে।

১৮ ॥ দেশ ও কাল ॥

সাংখ্যেরা সমুদায় পদার্থকে ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাহেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—দেশ ও কাল উক্ত তিনের কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ?

এই বিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্রের মতের কিছু অসংলগ্নতা দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, "দেশ" কাহাকে বলে? দেশ, দিক্, ব্যোম ও আকাশে কিছু ভেদ আছে কি? অনেকে ব্যোম ও আকাশকে Ether বলিয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। কিন্তু ইংরেজী বিজ্ঞানের "ঈথর" নামক অতীন্দ্রিয় পদার্থ যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতেন, তাহা আমার জানা নাই। আকাশকে শব্দের কারণ বলিয়া প্রাচীনেরা অনুমান করিতেন; উত্তাপ বা জ্যোতির কারণ বলিয়া অনুমান করিতেন না। সুতরাং প্রাচীনদের আকাশ বা ব্যোমের সহিত ঈথরের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমার বিবেচনায়, প্রাচীনেরা এতদ্দেশে ব্যোম, আকাশ, দিক্, দেশ ইত্যাদি শব্দে মূলে একই পদার্থ বুঝিতেন। দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও

বেধ যে পদার্থের আকার, তাহাকে অসীম বলিয়া মনে করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহারই নাম আকাশ। দেশাদি তাহারই নামান্তরমাত্র। ইংরেজীতে ইহাকে Space বলে।

প্রথমতঃ দেখা যায়, আকাশকে পঞ্চভূতের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। তাহা হইলে তাহা জ্ঞানের বিকারমাত্র। তাহা "ব্যক্ত" শ্রেণীর অন্তর্গত হয়। তাহাকে স্বতন্ত্র বা নিত্যপদার্থ বলা যায় না।

বাস্তবিকই কপিলসূত্রের ৫—৭২ সূত্রের ভূমিকায় টীকাকার লেখেন,—

"মনঃকালাদানাং নিত্যত্বং প্রতিষেধতি।"

—এখানে আদি শব্দে আকাশ বা দেশ বুঝিতে হইবে। টীকাকারের মতে, দেশ ও কাল নিত্য নহে, এই কথা প্রতিপাদনকরণার্থই উক্ত সূত্র রচিত। সূত্রটি এই,—

"প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বম্ অনিত্যম্।"

দেশ কাল প্রকৃতির মধ্যেও পড়ে না—পুরুষের মধ্যেও পড়ে না; সুতরাং উভয়েই অনিত্য। টীকাকার

আরো ব্যাখ্যা করেন যে, প্রকৃতির যে গুণ থাকাতে আত্মার "আকাশ" জ্ঞান হয়—সেই কারণ অবস্থাপন্ন আকাশ প্রকৃতির সহিত অভিন্ন ও নিত্য হইলেও যে আকাশ "ব্যক্ত" তাহা স্পষ্টই অনিত্য।

কিন্তু স্থানান্তরে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত দেখা যায়। আত্মার দুঃখের কারণ কি, ইহার বিচারস্থলে কেহ কেহ বলেন যে, দেশ ও কালের সহিত আত্মার সংযোগ সংসাধিত হওয়ায় আত্মা দুঃখ অনুভব করে। কপিল এই মতের খণ্ডনাভিপ্রায়ে বলেন,—

"ন কালযোগতঃ—
"ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্বসংবন্ধাৎ।" ১—১২।
"ন দেশযোগতোঽপি অস্মাৎ।" ১—১৩।

দেশ ও কাল ব্যাপী (Infinite, এবং নিত্য (Eternal)। বদ্ধ অবস্থাতেও আত্মার সহিত ইহাদের যে সম্পর্ক, মুক্ত অবস্থাতেও সেই সম্পর্ক। দেশ ও কালের সহিত বিমুক্ত হইয়া আত্মা অবস্থান করে না। সুতরাং আত্মাকে স্বভাবতঃ বদ্ধ বলিয়া এবং তাহার দুঃখের পরিহার অশক্য বলিয়া স্বীকার না করিলে, দেশ ও কালকে দুঃখের কারণ বলা যায় না। এখানে স্পষ্টা-

ক্ষরে দেশ ও কালকে নিত্য পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

আমাদের এই বিরোধের মীমাংসা করিবার চেষ্টার আবশ্যক নাই। বাস্তবিক দেশ ও কাল যদি নিত্য হয়, তবে তাহারা কি পদার্থ, তাহা বুঝিবার যত্ন করা যাউক্।

দেশ ও কাল বদ্ধই হউক্, মুক্তই হউক্, যদি সমুদায় পুরুষের সহিত সকল অবস্থায় সম্বদ্ধ হয়,—তবে সাংখ্য-মতে তাহা প্রাকৃতিক পদার্থ নহে। এ দিকে তাহারা যদি নিত্য হয়,—তবে তাহারা হয় স্বাধীন পদার্থ, না হয় আত্মার অঙ্গীভূত। তাহাদিগকে স্বাধীন পদার্থ বলিয়া সাংখ্যেরা অঙ্গীকার করেন নাই; সুতরাং তাহা-দিগকে আত্মার অঙ্গ বলিতে হইবে। এরূপ স্থলে আত্মার সর্ব্বপ্রকার অনুভবই দেশ ও কালের আকার প্রাপ্ত হইবে, এবং দেশ ও কালের নিয়মে নিয়মিত হইবে। দেশকালকে অতিক্রম করিয়া চৈতন্য সম্ভব হইবে না। তাহা হইলে দেশ ও কালকে চৈতন্যের নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ, এই দুইটি পদার্থকে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার বলিতে হয়। প্রকৃতির সহিত আত্মার বর্ত্তমান সম্বন্ধের উচ্ছেদ হইলেও,

দেশ ও কালের সংস্কার উচ্ছন্ন হইবার নহে। ইহাই বোধ হয় সমীচীন সাংখ্যমত।

এই মত কত দূর যুক্তিসঙ্গত, তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্য নহে। কৃতবিদ্য চিন্তাশীল পাঠকেরা তদ্বিষয়ে নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন। দেশ ও কালের তত্ত্ববিষয়ে পণ্ডিতেরা আজিও বিসম্বাদী রহিয়াছেন।

---

১৯ ॥ আত্মার অস্তিত্ব ॥

আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব আছে কি না,—ইহা জড়ের কার্য্যমাত্র কি না, এতদ্বিষয়ে সাংখ্যদর্শনে ভূরি ভূরি আন্দোলন পরিদৃষ্ট হয়। এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ এতদ্দেশীয় নাস্তিবাদীদের একটি প্রসিদ্ধ তর্ক আছে যে, যদিও একটি মাধ্বীক ফলের (মহুয়ার) মাদকতাশক্তি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অনেক মাধ্বীক ফল একত্র করিলে তাহা হইতে মদ প্রস্তুত হইতে পারে, এবং মত্ততা জন্মে। তদ্রূপ নানাবিধ ভৌতিক পদার্থে দেহ নির্ম্মিত ; যদিও তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক চৈতন্য নাই, তত্রাচ তাহারা একত্রীভূত হইলে চৈতন্য উৎপাদন করে। অতএব চৈতন্যকে সংহত জড়ের ধর্ম্ম বলিতে হইবে। আত্মার স্বাধীন অস্তিত্বস্বীকারে প্রয়োজন নাই।

ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন ;—

"পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ"। ৩—১৭

কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে,—পঞ্চভূতে দেহ নির্ম্মিত।

"চতুর্ভৌতিকমিত্যেকে।" ৩—১৮

আবার কেহ কেহ আকাশকে বাদ দিয়া চারি ভূতে দেহ গঠিত বিবেচনা করেন।

"একভৌতিকমিত্যপরে।" ৩—১৯

পুনর্ব্বার কেহ কেহ বলেন যে, দেহ কেবল "ক্ষিতি" নামক ভূতেই গঠিত ; অন্যান্য ভূতে মৃত্তিকাগঠিত দেহকে ধারণ করে মাত্র (উপষ্টম্ভকমাত্র)। সে যাহাই হউক,—

"ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং।"

—চৈতন্যকে দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলা যায় না—কেন না,—

"প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।" ৩—২০

—দেহের প্রত্যেক উপাদানে তাহা লক্ষিত হয় না।

"প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ।" ৩—২১

—আর যদি চৈতন্য ভৌতিক ক্রিয়ার হইত, তাহা হইলে সংসারে সুষুপ্তি ও মরণের অভাব হইত। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে তোমাদের কোনও কালে গভীর নিদ্রা হইত না। গভীর নিদ্রায় যে দেহ অচেতন হয়,—ইহাতেই তাহাকে স্বভাবতঃ অচেতন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যদি বল,—

"মদশক্তিবচ্চেৎ" ...

—ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের যোগে মদশক্তির যেমন উদ্ভব হয়, দেহের চৈতন্যও তদ্রূপ।

উত্তর,—"প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ।" ৩—২২

—যদি দেহের প্রত্যেক উপাদানে চৈতন্য দেখিতাম, তাহা হইলে এ কথা একদিন বলা যাইত। কেন না, প্রত্যেকে যাহা নাই,—তাহাদের সংহতিতে তাহার আবির্ভাব সম্ভবে না।

এ তর্কটি বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে যেন প্রতিপক্ষদেরই জয়লাভ হইয়াছে। প্রতিপক্ষদের কথাই এই যে, প্রত্যেকে যাহা নাই, তাহা সংহতিতে উৎপন্ন হইতে পারে, যেমন মাধ্বীকের মদশক্তি। ইহার উত্তর কি?—এ কথা একদিন বলা যাইতে পারে যে, যেমন একটি মহুয়াতে মদশক্তি না থাকিলেও অনেক মহুয়াতে তাহার উদ্ভব হয়—সত্য;—কিন্তু অনেক মাটি একত্র করিলে—কিম্বা অনেক জল একত্র করিলে কি তাহাতে চৈতন্য জন্মে? প্রতিপক্ষদের দৃষ্টান্তের সহিত দেহের সাদৃশ্য নাই।

তবে রসায়নশাস্ত্রের দৃষ্টান্তে আপত্তি করা চলে যে, একজাতীয় ভৌতিক পদার্থে প্রত্যেকে যে গুণ লক্ষিত হয় না,--ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভৌতিক পদার্থের রাসায়নিক মিশ্রণে সে গুণও লক্ষিত হয়। দেহের চৈতন্য যদি সেরূপ হয়? ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন,—

"ন ভূতচৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহিত্যেঽপিচ সাংহত্যেঽপিচ।" ৫—১২৯।

"দেহ" বিরোধস্থল; দেহ ছাড়িয়া ভৌতিক পদার্থের প্রত্যেকে কিম্বা সংহতিতে তোমরা যদি অন্য কোনও স্থলে চৈতন্য দেখাইতে পার ত বিশ্বাস করি। তোমরা রাসায়নিক উপাদানে একটি কীট গড়িয়া দাও, তবে তোমাদের যুক্তির যাথার্থ্য অঙ্গীকার করিব।

এই উত্তরে রসায়নবাদিগণকে নিরস্ত করা চলে বটে, কিন্তু ইহাতে কোনও মীমাংসা হইল না। ইহাতে সন্দেহ থাকিয়া গেল। চৈতন্যকে দেহের ধর্ম্ম বলিয়া অকাট্য যুক্তি দ্বারা এ পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন করিতে কেহ সক্ষম হয় নাই সত্য; কিন্তু চৈতন্য যে আত্মার ধর্ম্ম, তাহারই বা অকাট্য যুক্তি কি? চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম, ইহা এক কথা; চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম নয়, ইহা আর এক কথা।

চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম কি না, এই বিচারে, যতক্ষণ না চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম নয়—ইহা প্রতিপন্ন হয়—ততক্ষণ অন্ততঃ সন্দেহের অবসর থাকিয়া যায়। কেন না, দেখা যায়,—দেহকে আশ্রয় না করিয়া চৈতন্য থাকে না। কৃত্রিম দেহে চৈতন্য সঞ্চার করা যায় না সত্য, কিন্তু দেহ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি চৈতন্যের সত্তা কি কেহ দেখিয়াছেন? সাংখ্যেরা বলেন,—

অস্তি আত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ। ৬—১।

চৈতন্যের আধারভূত আত্মা নাই, এ কথা কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন না ; অতএব আত্মা আছে, ইহা সিদ্ধ।

কিন্তু আত্মা নাই, ইহার প্রমাণ না থাকিলেও, আত্মা আছে, ইহার প্রমাণ কি? সাংখ্যেরা হয় ত বলিবেন—প্রতীতি।

প্রত্যেক মানুষের আমি বা "অহং" বলিয়া প্রতীতি হয় ; সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু প্রতিপক্ষেরা এ স্থলে আপত্তি করিতে পারেন যে, সাংখ্যাচার্য্যদের মতে "অহঙ্কার" আত্মার স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যের অঙ্গ নহে। এমন কি, প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ-জন্য যে জ্ঞান হয়, যাহার পারিভাষিক নাম "মহৎ",

তাহার আদি স্ফূর্ত্তিতেও অহঙ্কারের সদ্ভাব নাই। এ অবস্থায় অহঙ্কারের প্রতীতি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়?

সাংখ্যেরা আরো কতিপয় প্রমাণের উল্লেখ করেন; যথা,

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান। ১—১৩৯

আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন; কেন না,

সংহতপরার্থত্বাৎ। ১—১৪০

দুই বা ততোধিক দ্রব্যের মিশ্রণ, তৃতীয়ের কোন আবশ্যক ব্যতিরেকে ঘটে না; সুতরাং পাঞ্চভৌতিক শরীর —আত্মার কোনও প্রয়োজনসাধনের জন্যই অবশ্য হইয়াছে। যদি এই যুক্তি ভাল না লাগে—আরো বলি,—

ত্রিগুণাদিবিপর্য্যাৎ। ১—১৪১

—চৈতন্য যে আত্মার লক্ষণ, প্রাকৃতিক পদার্থের গুণের সহিত তাহার কোনও সাদৃশ্য নাই।

অধিষ্ঠানাচ্চেতি॥ ১—১৪২

—অপরঞ্চ,—আত্মা দেহের অধিষ্ঠাতা; আত্মার ইচ্ছামতে দেহ চালিত হয়। ইচ্ছাশক্তির অনুভবে আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ।

ভোক্তৃভাবাৎ ॥ ১—১৪৩

সুখদুঃখের ভোক্তা বলিয়া আত্মার অনুভব হয়, তাদৃশ অনুভবেও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ।

স্থানান্তরে আরো এক প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়; যথা,—

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ ॥ ৬—২

ইহা "ত্রিগুণাদিবিপর্য্যাৎ" সূত্রের পুনরুক্তিমাত্র। পুনশ্চ,—

ষষ্ঠিব্যপদেশাৎ অপি ॥ ৬—৩

—অর্থাৎ, "আমার শরীর"—"আমার বুদ্ধি" ইত্যাদি স্থলে শরীর হইতে বিভিন্ন আত্মার অনুভব দেখা যায়। সাংখ্যেরা আরো বলেন,—

সামান্যেন বিবাদাভাবাৎ ধর্ম্মবন্ন সাধনম্ ॥ ১—১৩৮

টীকাকার অন্য সূত্রের টীকায় লেখেন,—

"জানামীত্যেবং প্রতীয়মানতয়া পুরুষঃ সামান্যতঃ সিদ্ধ এবাস্তি"।

—যখন "জ্ঞান হইতেছে" বলিয়া প্রতীয়মান হয়,—তখন মনুষ্য মাত্রই আত্মার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করে। সামান্যতঃ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও বিবাদই নাই, এবং তদ্বিষয়ে অন্য সাধন বা প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

তবে আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন কি না, তাহা উল্লিখিত হেতু দ্বারা নির্ণীত হয়।

সাংখ্যশাস্ত্রের সমুদায় যুক্তি একত্র করিলে এইরূপ দেখা যায়।—আত্মা আপনার অস্তিত্বের এবং আপনার অবস্থান্তরের অনুভব সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। আপনার জ্ঞান—আপনার সুখদুঃখ—আপনার রাগদ্বেষ—আপনার ইচ্ছাশক্তির অনুভবে আত্মা স্বীয় অস্তিত্বের অনুভব সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। অতএব আত্মার অস্তিত্ব স্বতসিদ্ধ। আর সেই আত্মা যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, জ্ঞান, সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ, ইচ্ছাদি যাহা আত্মার অবস্থা, এবং গুরুত্ব, চঞ্চলত্ব, প্রকাশকত্বাদি যাহা জড়ের অবস্থা, এই উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। যাহাদের অবস্থা এরূপ বিসদৃশ, তাহাদিগকে অভিন্ন পদার্থ বলা যায় না। "গতিতে" ও "জ্ঞানেতে" আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই দুইটি সম্পূর্ণ বিসদৃশ অবস্থা যে একই পদার্থের এপিঠ ওপিঠ, তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব।

অতএব আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে "চৈতন্যের স্বতঃসিদ্ধতা"—"ত্রিগুণ হইতে বৈচিত্র্য"—"অধিষ্ঠাতৃত্ব"

এবং "ভোক্তৃভাব." এই চারিটি যুক্তিকেই প্রাধান্য প্রদান করিতে হয় (১)

---

(১) দেহ ও আত্মার সম্বন্ধের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিকে দেহাত্মবাদের পোষক বলিয়া বোধ হয়,—

১। দেহের সহিত বিযুক্ত আত্মা দর্শনের অতীত।

২। দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার শক্তি স্ফূর্ত্তি পায়।

৩। দেহের ক্ষয়ের সহিত আত্মার শক্তিরও ক্ষয়।

৪। দেহের বিকারে আত্মা বিকৃতভাবাপন্ন হয়।

৫। গভীর নিদ্রায় আত্মার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

৬। জাগ্রৎ অবস্থার আত্মা ও স্বপ্ন আবস্থার আত্মা এক নহে। স্বপ্নাবস্থায় যাহা আমি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা আমি বলিয়া স্বীকার করি না। অন্ততঃ স্বপ্নাবস্থায় যে অহংজ্ঞান, তাহা দেহের কার্য্য। তবে জাগ্রৎ অবস্থাতেই অহংজ্ঞান দেহের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে না কেন?

৭। মানসিক পরিশ্রমে দেহের ক্লান্তি বোধ হয়।

৮। দেহ অবসন্ন ও ক্লান্ত হইলে, মানসিক কার্য্য ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসে।

৯। মুমূর্ষু-অবস্থায় আত্মার শক্তি সকল একবারে অন্তর্হিত না হইয়া ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে। যেমন দেহের একটু একটু করিয়া ক্ষয় হয়, সেই সঙ্গে আত্মারও ক্ষয় হইয়া থাকে।

২০। সাংখ্যদর্শনে "শ্রুতি" প্রমাণ কি না ?

শুনিতে পাই (১) এই প্রবন্ধমালায় সাংখ্যদর্শনের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে, তাহা সাংখ্যমতের বিরুদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। সন্দেহকারিগণ যদি

---

(১) সন ১৩০১ সালের পৌষমাসের "সাহিত্যে" মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় লিখিত হইয়াছে,—

"সাধনা। অগ্রহায়ণ। এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের সাংখ্যদর্শন। যুক্তির মর্য্যাদা, আত্মা ও দীপশিখা এবং অদ্বৈতবাদ—লেখক সাংখ্যদর্শন প্রস্তাবে এবার এই বিষয়ত্রয়ের অবতারণা ও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল এবং বলিবার প্রণালী উৎকৃষ্ট। কথাপ্রসঙ্গে শুনিতে পাই, বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শন সাংখ্যমতের বিরুদ্ধ হইতেছে ; আমরা আশা করি, তাঁহারা প্রবন্ধান্তরে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিবেন। যতদিন প্রতিবাদ না হয়, ততদিন বটব্যাল মহাশয়ের ব্যাখ্যা অস্বীকার করিবার কারণ দেখা যায় না। দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় সংস্কার না থাকিলে এরূপ বিতর্কের মীমাংসা বা এ বিষয়ে মতপ্রকাশ সম্ভবে না।"

সন্দেহের কারণ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের নিকট বিশেষ বাধিত হইব ; এবং নিজের ভ্রম বুঝিলে, তাহা অকপট হৃদয়ে অঙ্গীকার করিব।

যৎকালে বিদ্যালয়ে প্রথম সাংখ্যদর্শন পাঠ আরম্ভ করি, তৎকালে ইহা নিতান্ত অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইত। অধ্যাপকগণকে জিজ্ঞাসা করিলে অনেক কথার সদুত্তর পাইতাম না। সূত্রগুলির রচনা চমৎকার হইলেও তাহা বড়ই অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইত। ভাষ্যকারদের ভাষ্যে অস্পষ্টতা দূরীভূত হওয়া দূরে থাকুক্—তাহা পাঠে অনেক স্থলে বেদের "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"—এই বাক্য স্মরণ হইত।

বিদ্যালয়-পরিত্যাগের পর স্বাধীন অধ্যয়ন ও চিন্তার সাহায্যে যেন অন্ধকারের মধ্যে স্থানে স্থানে আলোকের উন্মেষ দেখিতে লাগিলাম ; তাহাই এক্ষণে পাঠকগণকে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

মনুষ্যের রচিত কোনও শাস্ত্রই নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক, অথবা নিরবচ্ছিন্ন সত্যমূলক হইতে পারে না। কপিলের শাস্ত্রের পক্ষেও এই কথা খাটে। দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিতে গেলে গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিতে হয়। ফলতঃ দর্শনের

অনুশীলনে গোঁড়ামী অন্তর্হিত হয় বলিয়া ইহার অনুশীলন আদরণীয়।

পাঠকগণ, বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধ-মালার লেখক মহর্ষি কপিলকে একজন প্রগাঢ়-ধীশক্তি-সম্পন্ন সমুজ্জ্বল প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন; কিন্তু তা' বলিয়া তিনি কপিলকে অভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহেন। কপিলের প্রতি মনের ভাব এইরূপ থাকিলেই তাঁহার উপদেশের সারসঙ্কলন সম্ভব।

কপিলের যে সকল ভাষ্যকার কপিলকে একবারে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি তাহাতেই প্রকাশ। তাঁহারা কপিল যে যে স্থানে ভুলিয়াছেন, তা'হা বুঝিতে এবং বুঝাইতে অক্ষম। সেই মর্ম্মগ্রহণের অক্ষমতা কপিল যেখানে ভুলেন নাই, সেখানেও প্রকাশিত।

একজন ভাষ্যকার কপিলসূত্রের প্রথমসূত্র ব্যাখ্যাবসরে লিখিতেছেন;—

"অথ জগদুদ্দিধীর্ষুর্মহামুনিঃ কপিলঃ ফলসৌন্দর্য্যজ্ঞানস্য ফলেচ্ছা দ্বারা সাধনপ্রবৃত্তৌ কারণত্বং পশ্যন্ ফলসৌন্দর্য্যমাহ।

এই ভাষ্যকার কপিলকে "জগতের ত্রাণকর্ত্তা" বলিয়া বিশ্বাস করেন; এইরূপ গোঁড়া ভাষ্যকারদের ভাষ্য সতর্কতার সহিত পাঠ করিতে হয়।

ফলতঃ কপিলের শাস্ত্রকে, সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় বলিয়া অনুশীলন করিলে, সেই শাস্ত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য্য অননুভূত থাকিয়া যায়।

যাহা "কপিলসূত্র" বলিয়া এক্ষণে প্রচলিত, ইহার অনেক অংশ স্পষ্টই কপিলের রচনা বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না।

সাংখ্যেরা যে সকল পদার্থ স্বীকার করেন, "ব্যাপ্তি" তদন্তর্গত কি না, ইহার বিচারে এই দুইটি সূত্র দেখা যায়;—

নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ। ৫—৩১

আধেয় শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ। ৫—৩২

এ স্থলে গৌরবে বহুবচনান্ত আচার্য্যাঃ পদে আদিসাংখ্যাচার্য্য কপিলকে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে এই সূত্র কপিলের পরবর্ত্তী শিষ্যদের বচন, ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। আর পঞ্চশিখাচার্য্য কপিলের বহুকাল পরে প্রাদুর্ভূত হয়েন। কপিলের বচনে পঞ্চশিখের

নাম থাকা অসম্ভব। স্পষ্টই এই সূত্র কপিলের পরে রচিত।

যাঁহারা প্রণিধানের সহিত "কপিলসূত্র" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সূত্রের অনুস্থলে পুনরুক্তি এবং বিসম্বাদ দেখা যায়; এই প্রবন্ধমালাতেই কোনও কোনও স্থলে তাদৃশ প্রবন্ধের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। অতএব প্রচলিত কপিলসূত্রকে ব্যক্তিবিশেষের রচনা না বলিয়া, সম্প্রদায়বিশেষের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

যদি কপিলের মূল মত কি ছিল, জানিবার প্রযত্ন করা হয়,—তবে সাংখ্যদর্শনের পরিভাষাতেই তাঁহার মত অন্বেষণ করিতে হইবে। আমরা যদি ইহযুগে বঙ্গভাষায় নূতন দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত করিতে বাঞ্ছা করি —তবে সাংখ্যদর্শনের পরিভাষা হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। সেই পরিভাষার প্রকৃত অর্থ আবিষ্কারই এই প্রবন্ধমালার বিশেষ উদ্দেশ্য।

"দর্শন" এই কথাটিই একটি পারিভাষিক শব্দ। যাঁহারা "বেদশাস্ত্র" হইতে ভিন্ন "দর্শনশাস্ত্রের" মূল পত্তন করিয়াছিলেন—তাঁহারা কি বুঝিয়া নূতন শাস্ত্রকে "দর্শন" এই সমাখ্যা প্রদান করেন?—বেদশাস্ত্রে ঈশ্বর ও পরলোকের

কথা; দুইটিই ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়। কেহ তাহা দর্শন করে নাই—চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিতেও পারিবে না।—মরিয়া যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের আলাপ চলিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের আত্মা দ্রষ্টব্য পদার্থ। আত্মা কি, তাহা আমরা সকলেই জানি, অর্থাৎ মোটামুটি জানি। কেন না, জ্ঞানের প্রত্যেক ক্রিয়াতে আত্মার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ করা হয়। অতএব ঈশ্বর ও পরলোক বিজ্ঞান—"অদৃষ্ট" বিষয়ক; আর আত্মবিজ্ঞান "দৃষ্ট" বিষয়ক। অতএব যে বিজ্ঞানে আত্মার তত্ত্ব অধীত, আলোচিত ও উপদিষ্ট হয়, তাহাকে বেদ হইতে পৃথক বিবেচনা করিয়া "দর্শন" বলিয়া তাহার নূতন নামকরণ হইল। বাহ্যজগতের তত্ত্ব দর্শনযোগ্য বলিয়া এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত।

যাঁহারা "দর্শন" এই পরিভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারা যে দর্শন ও বেদের মধ্যে প্রমাণপ্রমেয়গত ভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

আমি বলিয়াছি দর্শনশাস্ত্রে শ্রুতি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই কথা হয় ত অনেকের সাংখ্যমতের

বিপরীত ও বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কেন না কপিলসূত্রের কোনও কোনও স্থানে, শ্রুতিকেও প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। আমি বিবেচনা করি, কপিল "শ্রুতিকে" প্রমাণ অঙ্গীকার করিলেও, তাহাকে দার্শনিক প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন নাই। ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে ; কিন্তু "দর্শন" শাস্ত্রে শ্রুতি প্রমাণ নহে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই কপিল স্বীয় বিজ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং শ্রুতিকে কেবল ব্রহ্মবিজ্ঞানেরই ভিত্তি বলিয়া মানিতেন।

যাঁহারা মনে করেন যে, কপিল ঈশ্বর মানিতেন না —আমি বিবেচনা করি তাঁহারা ভ্রান্ত। তবে কপিল স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, দর্শনশাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণে ঈশ্বর প্রমাণিত হন না। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—

প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৫—১০

সংবন্ধাভাবাৎ নানুমানম্ ॥ ৫—১১

ভাষ্যকার লেখেন,—

"তৎসিদ্ধিঃ—নিত্যেশ্বরসিদ্ধিঃ। ঈশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং

নাস্তি। অনুমান শাব্দাবেব প্রমাণে প্রমাণে বক্তব্যে। তে চ ন সংভবত ইত্যর্থঃ।—

এইটি অপব্যাখ্যার একটি নিদর্শনস্থল—আচার্য্যের প্রকৃত মত ভাষ্যকারগণ কি প্রণালীতে অপলাপ করিয়াছেন, শ্বেতকে কিরূপে তাঁহারা কৃষ্ণ করিয়াছেন, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। মূলে "শাব্দ" বা শ্রুতি-প্রমাণের কথামাত্র নাই। কিন্তু ভাষ্যকার গোঁজামিশাল দিয়াছেন।

কপিল বলিতে চাহেন যে, তিনি স্বীয় বিজ্ঞানে যাহা প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাদৃশ প্রমাণে ঈশ্বর আছেন, এ কথা প্রমাণ হয় না। প্রত্যক্ষের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রমাণ হয় না; এবং প্রত্যক্ষের সহিত কোনও সম্বন্ধ না থাকায়, অনুমানের দ্বারাও প্রমাণ হয় না।

ভাষ্যকার বা পরকালবর্ত্তী কপিলশিষ্যেরা যে, "শ্রুতির প্রমাণেও ঈশ্বর অসিদ্ধ" এই এক নূতন কথা যোগ করিয়া দিয়াছেন ইহা নিতান্ত অসত্য। শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিলে, তদ্দ্বারা ঈশ্বর আছেন, একথা প্রতিপন্ন হয় না যিনি বলিবেন, তিনি নিতান্ত বাতুল। শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিলে—

"প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ।" ৫—১০

—এ কথা কপিলের মুখ হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। ঈশ্বর আছেন—ঈশ্বর আছেন—এ কথা শ্রুতির আদি—শ্রুতির মধ্য—শ্রুতির অন্ত।

কপিল যখন বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর আছেন, ও কথার প্রমাণ নাই—তখন তিনি প্রমাণ অর্থে কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটিকেই প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমার বিশ্বাস যে, মূল কপিলবিজ্ঞানে "শ্রুতি" প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। নতুবা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"—"প্রমাণভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ" ইত্যাদি সূত্র কপিলের দ্বারা উপদিষ্ট হইত না। সাংখ্যদর্শনের সময়ে শ্রুতি যে কোনও কোনও স্থানে প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে—ইহা অর্ব্বাচীন কপিলশিষ্যদের ভ্রমমাত্র। আমার বিবেচনায় যে যে সূত্রে শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া সাংখ্যমতের পোষকতার চেষ্টা করা হইয়াছে—সে সমুদায় কপিল হইতে অর্ব্বাচীন।

যাঁহারা এই প্রবন্ধমালা পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে, যাহা কপিলসূত্র বলিয়া পরিগণিত, তাহা ব্যক্তি-বিশেষের রচনা নহে—সম্প্রদায়বিশেষের রচনাভাণ্ডার—এই কথাটি স্মরণ রাখিবেন। তাঁহারা

যেন ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা সাবধানতার সহিত গ্রহণ করেন। এবং তাঁহারা অসারের মধ্যে যেন সারান্বেষণের চেষ্টা করেন।

কপিলসূত্রভাণ্ডারেই এ সম্বন্ধে কতকগুলি রত্নস্বরূপ উপদেশ দেখা যায়। যথা,—

"বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্পদবৎ ॥ ৪—১৩

ভাষ্য। শাস্ত্রেভ্যো গুরুভ্যশ্চ সার এব গ্রাহ্যঃ। অন্যথা অভ্যুপগমবাদাদিভিঃ উক্তে অসারভাগে অন্যোঽন্যবিরোধেন অর্থবাহুল্যেন চ একাগ্রতায়া অসংভবাৎ।"

—অর্থাৎ শাস্ত্রসমূহে যাহা পাঠ করা যায়, এবং গুরুগণ হইতে যাহা উপদেশ পাওয়া যায়—তাহার এক অংশ সার—অপর অংশ অসার। সারাংশই গ্রাহ্য। অনেক স্থলে "অভ্যুপগম" * ও "বাদ" আদি দ্বারা অসার কথা দেখা যায় ; অনেক স্থলে নানা অর্থে ব্যবহার্য্য শব্দের প্রয়োগ থাকে। যে পাঠক এই সকল কথা স্মরণ না

---

* অভ্যুপগম—Implication অর্থাৎ আভাস। যাহা স্পষ্টাক্ষরে উপদিষ্ট না হইয়াও উপদেষ্টা কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত বলিয়া বোধ হয়। বাদ—তর্ক। বিপক্ষকে পরাজয়করণার্থ যেমন-তেমন তর্ককে বাদ বলা যায়।

রাখিয়া সারভাগ ও অসার ভাগ তুল্যরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহার মূল বিষয়ে একাগ্রতা পৌঁছে না।

আর এক সূত্র এই,—

"ন উপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা; পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ॥" ৪—১৭

ভাষ্য। পরামর্শো গুরুবাক্যতাৎপর্য্যনির্ণায়কো বিচারঃ তং বিনা উপদেশবাক্যশ্রবণেঽপি তত্ত্বজ্ঞাননিয়মো নাস্তি প্রজাপতেরুপদেশশ্রবণেঽপি ইন্দ্রবিরোচনয়োর্মধ্যে বিরোচনস্য পরামর্শাভাবেন বিবেকাভাবশ্রুতেরিত্যর্থঃ।

—অর্থাৎ গুরুমুখে যাহা শুনিবে, স্বাধীন চিন্তা দ্বারা তাহার তাৎপর্য্যনির্ণয় করিতে যত্ন না করিলে উপদেশশ্রবণ ব্যর্থ হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা মধুর আর একটি সূত্র এই,—

"ন মলিনচেতসি উপদেশবীজপ্ররোহঃ, অজবৎ।" ৫—২৯

ভাষ্য। উপদেশরূপং যৎ জ্ঞানবৃক্ষস্য বীজং তস্য অঙ্কুরোঽপি রাগাদিমলিনচিত্তে নোপপদ্যতে। অজবৎ। যথা অজনাম্নি নৃপে ভার্য্যাশোকমলিনচিত্তে বসিষ্ঠেন উপ্তস্যাপি উপদেশবীজস্য ন অঙ্কুর উৎপন্ন ইত্যর্থঃ।

অর্থাৎ চিত্ত যদি রাগদ্বেষাদি দ্বারা মলিন থাকে, তথায় উপদেশের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। শাস্ত্রার্থের অনুশীলন

করিতে প্রবৃত্ত হইলে পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় লইতে হইবে ; এবং শাস্ত্রের মধ্যে কোন্ কথা সার, কোন্ কথা অসার তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

দর্শনশাস্ত্রে শ্রুতির বচন প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে না—আমার বিবেচনায় সাংখ্যবিজ্ঞানের এইটি একটি অতীব সারগর্ভ উপদেশ। কিন্তু অনেক শিষ্য আচার্য্যের এই উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছেন।

২১ ॥ সাংখ্যদর্শনের "গুণ" ॥

এই প্রবন্ধমালায় সাংখ্যদর্শনের "গুণ" শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে (৪র্থ প্রবন্ধ দেখুন) তাহার প্রামাণিকতা বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। অনেকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের "গুণের" সহিত সাংখ্যদর্শনের "গুণের" গোলমাল করিয়া বসেন। অনেক ইংরাজি অনুবাদেও সাংখ্যদর্শনের "গুণ"কে quality বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমার বিবেচনায় ইহা ভ্রম।

কপিলের এক প্রসিদ্ধ সূত্র এই,—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ ইত্যাদি ॥ ১—৬১ *

ইহার ভাষ্য এইরূপ,—

"সত্ত্বাদিদ্রব্যাণাং যা সাম্যাবস্থা অন্যূনাতিরিক্তা অবস্থা অকার্য্যাবস্থা ইত্যর্থঃ। এবং চ কার্য্যভিন্নং গুণত্রয়ং প্রকৃতিঃ ইতি পর্য্যবসিতোঽর্থঃ ॥"

পাঠকগণ দেখিবেন, এখানে স্পষ্টাক্ষরে সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্‌কে দ্রব্য বলা হইয়াছে। পাছে স্থূলদর্শী পাঠকের

---

* এই সূত্র পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, সত্ত্বাদিকে quality বলিলে—প্রকৃতিকেও quality বলিতে হয়—কেন না, গুণের অবস্থা কখনও দ্রব্য হয় না।

সম্যক হৃদয়ঙ্গম না হয়, তজ্জন্য ভাষ্যকার আবার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বলিতেছেন,—

"সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি—ন বৈশেষিকা গুণাঃ। সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ—লঘুত্বগুরুত্বাদি ধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষু অত্র শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুবন্ধক ত্রিগুণাত্মকমহাদাদি-রজ্জুনির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে॥"

অর্থাৎ কেবল "গুণ" এই শব্দের ব্যবহার দেখিয়া, সাংখ্যশাস্ত্রের গুণকে বৈশেষিক বা ন্যায়দর্শনের গুণ বলিয়া ধরিও না। সাংখ্যদর্শনে যাহাকে "গুণ" বলে, তাহা বাস্তবিক ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের দ্রব্যের সমতুল্য। কেন না, এই সকল "গুণ" পরস্পর সংযুক্ত বিযুক্ত হয়; ইহাদের "গুরুত্ব" "লঘুত্ব" আদি বৈশেষিক দর্শনসম্মত গুণ আছে। পুরুষের উপকরণ হেতু বা পুরুষকে রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করে বলিয়া, ইহাদিগকে গুণ বলা যায়। ফলতঃ, ভাষ্যকার এ স্থানে "গুণ" শব্দের যে অর্থ দিয়াছেন, তাহা ঠিক। আমিও গুণ শব্দের অবিকল এই অর্থ বুঝিয়াছি। কিন্তু ভাষ্যকার সত্ত্বাদিকে গুণ বলায় যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ভুল বলিয়া মনে হয়। রূপক ধরিয়া গুণের অর্থ করার কোন আবশ্যক

নাই। সরল অর্থে "গুণের" বিপরীত "প্রধান"। তাহার প্রমাণ,—

"আপেক্ষিকো গুণপ্রধান ভাবঃ ক্রিয়োবিশেষাৎ॥ ২—৪৫

সূত্রে দ্রষ্টব্য। প্রকৃতি=প্রধান; সত্ত্বাদি=গুণ। অর্থাৎ, গৌণ বলিয়াই সত্ত্বাদির নাম "গুণ"। সত্ত্ব রজস্ তমসের সাধারণ নাম প্রকৃতি; প্রকৃতি বলিলে উক্ত তিন পদার্থেরই অবস্থা বিশেষ বুঝায়। প্রকৃতি নামক প্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত গৌণ শ্রেণীর পদার্থ—সত্ত্ব রজস্ তমস্ ইতি। ফলতঃ বড় বড় পণ্ডিতেও সাংখ্যদর্শনের "গুণ" ও ন্যায়দর্শনের গুণকে যে এক বলিয়া ভ্রান্ত হয়েন—ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহাতে এইমাত্র প্রকাশ পায় যে, আজকাল এ প্রদেশে সাংখ্যদর্শন যত্নের সহিত অধীত বা উপদিষ্ট হয় না।—ডাক্তার ব্যালাণ্টাইনের The Saukhya Aphorisms of Kapila গ্রন্থে উপরি-উক্ত ভাষ্য উদ্ধৃত থাকিলেও, তিনি গুণকে quality বলিয়া অনুবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হস্তেও সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে মধ্যে এমনি দুর্দ্দশা ঘটে!

এই ভ্রমের সংসৃষ্ট অপর একটি ভ্রান্তি দেখা যায়;

তদনুসারে প্রকৃতি জাতিবাচক শব্দ না বলিয়া ব্যক্তিবাচক শব্দ বলিয়া পরিগৃহীত। অনেকে ভাবেন, প্রকৃতি "এক", অর্থাৎ একটি জিনিষ। এ ভ্রম যে, কেবল আধুনিক পাঠকবর্গের, তাহা নহে,—অনেক প্রাচীন পণ্ডিতেও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।—সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর প্রারম্ভেই প্রকৃতির বর্ণনা এইরূপ,—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ।"

—অসাবধান পাঠকে হঠাৎ ঈদৃশ ভাষাতে প্রকৃতিকে একটি দ্রব্য বলিয়া ভ্রান্ত হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, সত্ত্ব রজস্ তমস্ যদি তিনটি দ্রব্য হয়—তবে প্রকৃতি কদাচ একটি মূল দ্রব্য হইতে পারে না।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"।

—এই সূত্রে দেখা যায় যে, সত্ত্ব রজস্ ও তমস্ নামক দ্রব্যত্রয়ের অবস্থাবিশেষের নাম প্রকৃতি। এই অবস্থা "সাম্যাবস্থা" বলিয়া সূত্রে বর্ণিত। আমি এই "সাম্যাবস্থা" সম্বন্ধে পূর্ব্বে দুই এক কথা বলিয়াছি। উপরে যে ভাষ্য প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে সাম্যাবস্থা অর্থাৎ অন্যূনাতি-রিক্তাবস্থা। ইহা বড় পরিষ্কার নহে। ভাষ্যকার অর্থ পরিষ্কার করিতে গিয়া লেখেন,—

"অকার্য্যাবস্থা ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ সত্ত্বাদি দ্রব্যত্রয় যখন কার্য্যে পরিণত না হয়—অর্থাৎ অন্য কোন পদার্থ উৎপাদন না করে—তখন তাহাদের যে অবস্থা, তাহার নাম প্রকৃতি;—যদি জিজ্ঞাসা কর, সে অবস্থা কি?—উত্তর—"অব্যক্ত" = জানি না!!! সাম্যাবস্থা কি, তাহা আমরা আদৌ পরিজ্ঞাত নহি। ইহা একটি দার্শনিক কল্পনা বা theory মাত্র। সত্ত্বাদি দ্রব্যত্রয় পুরুষের যে অবস্থান্তর সাধন করে—তাহা তাহাদের কার্য্য। তদবস্থায় তাহারা পরিজ্ঞাত। এবং সেই অবস্থা ন্যূনাতিরিক্ত অবস্থা। ন্যূন = কেন না কার্য্যটি ঠিক কারণ নহে। উত্তাপ এক প্রকার জ্ঞান, বা আত্মার অবস্থান্তর। উহা কার্য্য;—যাহা উহার ভৌতিক কারণ মনে কর, তাহার নাম "সত্ত্ব"। সত্ত্বের সহিত উত্তাপের কোন সাদৃশ্য নাই। সত্ত্বকে উত্তাপ বলিয়া ধরিলে ন্যূনতা ঘটে; অতিরিক্ত—কেন না উত্তাপ—"সত্ত্ব" হইতে বিভিন্ন পুরুষের ভাবান্তরমাত্র। ইহাতে অতিরিক্ত পুরুষ নামক দ্রব্যের আভাস আছে। অতএব সত্ত্বের কার্য্য যে উত্তাপ, তাহা সত্ত্বের ন্যূনাতিরিক্ত অবস্থা। মনে কর, সত্ত্ব কোনও কার্য্য করিতেছে না,

তৎকালে সত্ত্বের যে অবস্থা, তাহারই নাম প্রকৃতি। রজস্ তমসেরও তাদৃশ অবস্থার নাম প্রকৃতি।

ইহাতে স্থূলমর্ম্ম এই দেখা যায়। জড়জগতে যাহা নিত্য পদার্থ, তাহা তিন প্রকার,—সত্ত্ব, রজস্, তমস্। অথবা "ক"—"খ"—"গ"। ইহারা "অন্যোঽন্যাভিব-আশ্রয়-জনন-মিথুনবৃত্তয়ঃ।" অর্থাৎ পরস্পরকে অভিভূত করিয়া—কিংবা আশ্রয় করিয়া—জনন ও মিথুনবৃত্তিযুক্ত হয়। রাসায়নিক সংযোগের নাম অভিভব (chemical combination)। সন্নিকর্ষ সংযোগের নাম আশ্রয় (mechanical combination)। অভিভবের ফলে নূতন দ্রব্যের উৎপত্তি (জনন); আশ্রয়ের ফলে মিশ্র-দ্রব্যের উৎপত্তি (মিথুন)। ইহা ক-খ-গএর এক প্রকার কার্য্য। এ দিকে আধ্যাত্মিক জগতে "পুরুষ" নামক বহুসংখ্যক নিত্যপদার্থ বিগুমান। তাহাদিগকে "শ" "ষ" "স" বল। মনে কর, "শ" = কুক্কুর, "ষ" = শৃগাল, "স" = ব্যাঘ্র। "শ"এর উপর "ক"এর ক্রিয়াতে কুক্কুরের সূর্য্যদর্শন; "ষ"এর উপর "ক"এর ক্রিয়াতে শৃগালের সূর্য্যদর্শন; "স"এর উপর "ক"এর ক্রিয়াতে ব্যাঘ্রের সূর্য্যদর্শন। এখানে "ক"এর ত্রিবিধ আত্মার

উপর ত্রিবিধ ক্রিয়া বা কার্য্য দেখা যাইতেছে। ইহা আর এক প্রকার কার্য্য।

ক—খ—গএর অভিভবে ও আশ্রয়ে যে দ্রব্যান্তর প্রাদুর্ভূত হয়—বিবিধ শ্রেণীর আত্মার উপর তাহাদেরও তাদৃশ কার্য্য উৎপন্ন হয়।

সত্ত্ব রজস্ তমস্ এবং তাহাদের অন্যোহন্যাভিভবাশ্রয় জন্য দ্রব্যসংঘ যখন এই শেষোক্তরূপে পুরুষসংঘের জ্ঞানোৎপাদক হইয়া কার্য্যের জনক হয়, তখনই তাহারা দর্শনশাস্ত্রের সীমায় পৌঁছে। যাহা তাহাদের সাম্যাবস্থা বা অকার্য্যাবস্থা—তাহা দর্শনশাস্ত্রের অতীত একটি কল্পনা মাত্র। তাহাই সাংখ্যদর্শনের অব্যক্ত প্রকৃতি !!! তাহারা অন্যোহন্যকে অভিভূত বা আশ্রয় না করিয়া কোনও কালে অকার্য্যকর অবস্থায় থাকে কি না—বা থাকিতে পারে কি না—তাহার উত্তর দর্শনশাস্ত্র দিতে অক্ষম।

"কার্য্যভিন্নং গুণত্রয়ং প্রকৃতিঃ।"

—ইহা কেবল কথার কথা কি বাস্তব অবস্থা, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে বিজ্ঞানশাস্ত্রে ঐরূপ একটা কথা থাকা অত্যাবশ্যক।

২২॥ সাংখ্যদর্শনের "ইন্দ্রিয়"॥

এতদ্দেশীয় দার্শনিকেরা বলেন, ইন্দ্রিয় একাদশ প্রকার। চক্ষু কর্ণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; আর মন উভয়াত্মক মিশ্র ইন্দ্রিয়।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই, ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ কি?

ভাষা কথায় ইন্দ্রিয় ও সাংখ্যদর্শনের ইন্দ্রিয় এক নহে। মস্তকনিহিত গোলকদ্বয়কে সাংখ্যেরা চক্ষুরিন্দ্রিয় বলেন না; বিধৃতলেখনী অস্থিমাংসকে তাঁহারা "পাণি" নামক ইন্দ্রিয় বলেন না; কিংবা মস্তক-মধ্যস্থিত মজ্জাকে তাঁহারা মন বলেন না।

সাংখ্যেরা বলেন,—

"অতীন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ং, ভ্রান্তানাম্ অধিষ্ঠানে"॥ ২। ২৩

যাহা দর্শনশাস্ত্রসম্মত "ইন্দ্রিয়", তাহা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে; যাহারা অক্ষিগোলকাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানকে "ইন্দ্রিয়" বলে, তাহারা ভ্রান্ত।

ইন্দ্রিয় শব্দে সাংখ্যদর্শনসম্মত অর্থ আত্মার শক্তি। যে শক্তি থাকাতে আত্মা দেখিতে পায়, শুনিতে পায়,

তর্ক করিতে পারে, হস্তপদাদিসঞ্চালনরূপ প্রকৃতির গতি উৎপাদন করিতে পারে, তাহাই আত্মার "ইন্দ্রিয়"।

যদি তাহাই হয়, তবে একাদশ ইন্দ্রিয় স্বীকারের প্রয়োজন কি ? একমাত্র "শক্তি" নামক পদার্থ স্বীকার করিলেই ত হয় ? এ স্থলে সাংখ্যেরা বলেন,—

"শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ ন একত্বম্" ॥ ২ । ২৪

না ; কেন না, একমাত্র ইন্দ্রিয় অঙ্গীকার করিয়া তাহারই ভেদ বলিলে—ফলে ইন্দ্রিয়ের ভেদ অঙ্গীকার করা হইল—প্রকৃত ইন্দ্রিয়ের একত্ব প্রতিপন্ন হইল না। ভাষ্যকার এ স্থলে বলেন,—

"একস্য ইন্দ্রিয়স্য শক্তিভেদস্বীকারেঽপি ইন্দ্রিয়ভেদঃ সিধ্যতি। শক্তীনামপি ইন্দ্রিয়ত্বাৎ। অতঃ ন একত্বম্ ইন্দ্রিয়স্য ইত্যর্থঃ"।

এ স্থানে "শক্তীনামপি" না লিখিয়া "শক্তীনামেব" লেখা উচিত ছিল। সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, "শক্তির"ই নাম ইন্দ্রিয়। যদি শক্তির ভেদ স্বীকার কর, তবে ইন্দ্রিয়েরই ভেদ স্বীকার করা হইল।

অতএব দেখা যায়, সাংখ্যমতে আত্মার কতকগুলি অতীন্দ্রিয় শক্তি আছে ; তাহার দ্বারা দর্শন শ্রবণ আদি জ্ঞান, স্মরণ চিন্তন ভালবাসা রাগ করা ইত্যাদি "মনন",

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ আদি ক্রিয়া-করণ সংসাধিত হয়।

শক্তি = ইন্দ্রিয় ; অতএব অতীন্দ্রিয় শক্তি = অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়। কথাটা কেমন খাপছাড়া বোধ হয় না? "অতীন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ম্"—এ কেমন কথা? এ স্থলে "অতীন্দ্রিয়" শব্দ প্রচলিত অর্থ "অপ্রত্যক্ষ" এইমাত্র বুঝিলে আর কোন গোলযোগ নাই। যে পদার্থ বাহ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার জ্ঞানকে "প্রত্যক্ষ" বলা যায়। পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, ইন্দ্রিয় "অপ্রত্যক্ষ" বলিলে ইন্দ্রিয় একবারে জ্ঞানের অগোচর। আমাদের যে দর্শনাদি শক্তি আছে—তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি; কিন্তু যে অর্থে গোলাপ ফুলকে "দেখা" যায়, সে অর্থে তাদৃশ শক্তিকে "দেখা যায় না"।

অবিবেচক লোকে যাহাকে ইন্দ্রিয় বলে—সাংখ্যেরা তাহাকে কেবল "ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান" বলেন। সাংখ্যেরা যাহাকে ইন্দ্রিয় বলেন, সাধারণ লোকে তাহা বুঝে কি না সন্দেহ। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানের সহিত ইন্দ্রিয়ের কি সম্বন্ধ, ইহা দর্শনশাস্ত্রের একটি অতি জটিল প্রশ্ন। কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই সম্বন্ধ আমরা প্রত্যেকে

জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অনুভব করিয়াও তাহা ভাষাতে প্রকাশ করিতে পারি না। আমি বেশ অনুভব করিতেছি সে সম্বন্ধ কি,—কিন্তু তোমাকে বুঝাইতে গেলেই বিপদ! এই সম্বন্ধের বিষয়ে বলা যাইতে পারে,—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং
আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবৎ চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ"॥

ইহার কারণ অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের ভাষার অসম্পূর্ণতা। এই সম্বন্ধের তত্ত্ব ভাষায় বুঝাইতে গেলে নূতন ভাষা সঙ্কলন করিতে হয়। আমাদের প্রচলিত খাওয়া-পরার ভাষাতে এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকটন করা অসাধ্য।

২৩॥ সাংখ্যদর্শনের কার্য্যকারণ তত্ত্ব॥

সাংখ্যেরা বলেন—

নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ॥ ১।১১৪

অর্থাৎ যেমন মনুষ্যের শৃঙ্গ উঠে না,—তেমনি যাহা ছিল না, তাহা কদাচ উৎপন্ন হয় না।

অপিচ—

নাশঃ কারণলয়ঃ॥ ১।১২১

যখন কোনও পদার্থ বিনষ্ট হয়—তখন তাহার কারণে লীন হয় মাত্র। প্রকৃত পক্ষে কোনও পদার্থ ই নষ্ট হয় না। অর্থাৎ আমাদের এই সংসারে দ্রব্যের উৎপত্তিও নাই—দ্রব্যের বিনাশও নাই। যাহাকে তোমরা বল উৎপত্তি, তাহা আবির্ভাব মাত্র। সত্ত্ব রজস্ তমস্ নামক পদার্থপুঞ্জ—চিরকালই আছে, চিরকালই থাকিবে। একটা কলসী ভাঙ্গিয়া ফেল, তাহা পূর্ব্বে যে মৃত্তিকা ছিল, সেই মৃত্তিকাতেই পরিণত হইবে। কামনার আবির্ভাব তিরোভাবের ন্যায়, আমাদের এই সংসারের আবির্ভাব তিরোভাব হয়। যাহাকে আমরা কোনও পদার্থের কারণ বলি, তাহা সেই পদার্থের পূর্ব্বতন অবস্থা-বিশেষ মাত্র; যাহাকে আমরা কোনও পদার্থের কার্য্য

বলি, তাহা সেই পদার্থের পরবর্ত্তী অবস্থাবিশেষ মাত্র। সংসারে একটি বস্তুও হইতেছে না, বা সংসার হইতে একটি বস্তুও যাইতেছে না। সংসারে নিত্যবস্তু অনেক হয়, আর তাহাদের অন্যোন্যাভিভব ও অন্যোন্যাশ্রয় জন্য সর্ব্বদাই সংসারের আকার পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু কোন বস্তুরই কণামাত্র বিলুপ্ত হইতেছে না।

সাংখ্যদর্শনের এইটি একটি বিশিষ্ট যুক্তি। তাঁহারা এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ঘোষণা করেন, প্রকৃতি আদ্যন্তবিহীন—পুরুষও আদ্যন্তবিহীন। ইহারা যেমন সৃষ্টির অযোগ্য, তেমনি বিনাশেরও অযোগ্য।

২৪॥ সাংখ্যেরা বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিতণ্ডা স্থলে কি বলেন কি বা না বলেন॥

অতঃপর বোধ হয়, সাংখ্যদর্শনের কথায় "সাধনার" পাঠকবৃন্দ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন—এক কথা আর কতদিন ভাল লাগে? আমার মনে হইতেছে যে [illegible]ণে এই প্রবন্ধমালার উপসংহার করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে [illegible]র দুই একটি কথায় পাঠকবৃন্দের ধৈর্য্য ভিক্ষা করি।

এই নশ্বর সংসারে আমাদের কাহারো জ্ঞান[illegible] [illegible]সা কি ভোগলালসা মিটিতেছে না। আমরা সকলেই [illegible]নি, দুই এক দিন বাদে মৃত্যু নামক এক ঘোরতর [illegible]- বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। আমরা সেই অতৃপ্ত পি[illegible]াসা ও লালসা লইয়াই কি মরিব? মরিবার পর কি আর আমাদের ভোগ নাই, জ্ঞান নাই? আমরা সকলেই এই চিন্তায় জর্জরিত। যাহাকে আমরা দেহ বলি—তাহাই যদি আমাদের ষোল আনা হয়, তবে ত আমাদের মত হতভাগ্য জীব আর নাই! মনুষ্য এই চিন্তায় অধীর হইয়া, দেহব্যতিরিক্ত আত্মা আছে কি না, ইহার তর্কে প্রবৃত্ত হয়। আত্মা কি?—চেতনাময়-সুখময়-দুঃখময়-

বাঞ্ছাময়-ইচ্ছাময় একটা জিনিষ! দেহ কি?—রূপরস-গন্ধস্পর্শময় অচেতন একটা জিনিষ। আত্মা আছে—ইহার প্রমাণ কি?—জ্ঞান। দেহ আছে ইহার প্রমাণ কি? তাহাও জ্ঞান। বাঃ—এ ত বড় বিচিত্র কথা! জ্ঞানে কি প্রমাণ করে?—জ্ঞান কি জ্ঞান ভিন্ন অপর কোনও পদার্থেরই প্রমাণ হইতে পারে? যখন জ্ঞান হইতেছে—তখন অবশ্যই জ্ঞান আ ছে—কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু আছে, তাহার প্রমাণ কি?—

এস্থানে পৌঁছিয়া কেহ কে বলিয়া বসেন—সংসারটা একটা বিচিত্র রঙ্গতামাসা জায়গা—দেহও নাই—আত্মাও নাই; আছে কেবল জ্ঞান—জ্ঞান—জ্ঞান; অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের স্রোতের নাম সংসার।

সাংখ্য ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—না না; জ্ঞানে যেমন জ্ঞান প্রমাণ হয়, তেমনি ক্ষণিক ও ধারাবাহিক জ্ঞানরাশির আধারভূত "বিজ্ঞাতা" আত্মারও প্রমাণ হয়।

তবে জগৎসংসার আছে—না জগৎসংসার নাই?—এ প্রশ্ন স্থূলদৃষ্টি লোকের নিকট করিলে তাহাদের কেবল অবাক্ হইবারই কথা। কিন্তু জগৎসংসার আছে কিনা,

অনুধাবন করিয়া দেখিলে, আমাদের বিজ্ঞান-জীবনের এক অবস্থায় তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই অবস্থায় অনেক পণ্ডিতে জগৎসংসারই নাই বলিয়া বসেন। মহামতি কপিল জগৎকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত বলিয়া বিভিন্ন করিয়া বিজ্ঞানের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্যক্ত জগৎ স্থায়ী ভাবে নাই, অব্যক্ত জগৎ স্থায়ীভাবে আছে। জ্ঞানের দুই কোটি—এক কোটিতে বিজ্ঞাতার স্বতঃপ্রামাণ্য, অপর কোটিতে বিজ্ঞাতের স্বতঃপ্রামাণ্য। "জড়প্রকাশযোগাৎ প্রকাশঃ" —জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখিলেও তাহার চরম বিশ্লেষণ এইরূপ। অতএব সাংখ্যদর্শনে বৈজ্ঞানিক নাস্তিবাদ নিরস্ত করে।

তাহার পর বৈজ্ঞানিকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েন। এক দল মায়াবাদী—একদল জড়বাদী। কেহ বলেন জড় আত্মার কার্য্য, কেহ বলেন আত্মা জড়ের কার্য্য। সাংখ্যেরা এই দুই সম্প্রদায়কেই ভ্রান্ত বলেন। তাঁহারা বলেন, জড়ও আত্মার কার্য্য নয়, আত্মাও জড়ের কার্য্য নহে। আমাদের জ্ঞানের যতদূর সীমা—ততদূর

আমরা উভয়কেই পৃথক্ দেখি। আমরা কৃত্রিম মনুষ্যও গড়িতে পারি না, এবং কৃত্রিম মৃত্তিকাও গড়িতে পারি না।

দর্শন শাস্ত্রের যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর দেখা যায়, জড়ও স্বাধীন, আত্মাও স্বাধীন। উভয়ে জ্ঞ-জ্ঞেয় সম্বন্ধে আবদ্ধ মাত্র। কিন্তু সেই সম্বন্ধের বিশ্লেষণ ঘটিলেও, তাহাদের বিনাশের সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানের ধ্বংস হইলেও, আত্মার চৈতন্য বা জড়ের অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়ত্বের ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখা যায় না। কেন না, সাংখ্যদর্শন অনুসারে স্বাধীন নিত্য পদার্থ যে কদাচ বিনষ্ট হয়, তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় "অতিপ্রাকৃত" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,--

"বহিঃপ্রকৃতি অথবা জগৎ সর্ব্বতোভাবে মানব মনেরই সৃষ্টি,—এ কথাটা আমরা যখন তখন ভুলিয়া যাই।" ইহা প্রাচীন যোগাচারনামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ নাস্তিবাদ। কপিল ইহার খণ্ডন করিয়াছেন। কপিল অদ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্থানীয় হইলে লিখিতেন,—

"ব্যক্ত জগৎ—সর্ব্বতোভাবে মানব মন ও জড়-

প্রকৃতির জ্ঞ-জ্ঞেয় সম্বন্ধবশাৎ সৃষ্ট, এ কথাটা আমরা যখন তখন ভুলিয়া যাই।” (১)

ত্রিবেদী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে আরো লিখিয়াছেন,—“জগৎকে নিয়মানুযায়ী দেখিলে, আমার জীবনযাত্রার যথেষ্ট সুবিধা ঘটে—অনিয়ত দেখিলে জীবনযাত্রা ভার হইয়া উঠে। সেই জন্য আমার জগৎকে আমি নিয়মানুযায়ী, নিয়মের অধীন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।” এই “সেই জন্য” নামক বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্যাপারটা কপিলশিষ্যেরা জ্ঞানগম্য বলিয়া স্বীকার করেন না। অগ্নি দাহ করিলে আমার জীবনযাত্রার যথেষ্ট সুবিধা ঘটে দেখিয়া, অতঃপর অগ্নি নিত্য নিত্য দাহ করুক বলিয়া কি আমরা অগ্নিতে দাহিকাশক্তি অর্পণ করিয়াছি? সেই শক্তি অর্পিত হওয়ার পূর্ব্বে অগ্নি দাহ করিয়াছিল কিরূপে? ফলতঃ আমার মূল বক্তব্য এই যে, ত্রিবেদী মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিতদের দর্শন,—সাংখ্যদর্শন নহে।—সাংখ্যদর্শন জড়ের অপলাপ করে না—আত্মারও অপলাপ করে না।

---

(১) ত্রিবেদী মহাশয় যখন আমার এই লেখা পড়িবেন, তখন ভরসা করি স্বীকার করিবেন যে, এই লেখারূপ বাহ্য জগৎটা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মনের সৃষ্ট নহে।

যাঁহারা আত্মার সম্ভাবিত বিনাশের বিভীষিকাগ্রস্ত, তাঁহারা সাংখ্যদর্শন পাঠে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারেন।

কিন্তু প্রধান কথা এই, সাংখ্যদর্শন অনুসারে জীবনের লক্ষ্য কি? বাঁচিয়া আমাদের কি লাভ? সাংখ্যেরা বলেন,—

অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥ ১ । ১

মনুষ্য নানাবিধ ক্লেশে যে কষ্ট পায়, তাহার এককালীন সম্পূর্ণ অবসানই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রের মোক্ষ। ক্ষুধা পাইলে আহার করিলাম—রোগ হইলে চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য লাভ করিলাম; ইহাতে সাংখ্যের মন পরিতুষ্ট নহে। কিরূপে একেবারে ক্ষুধা না পায়, কিরূপে একেবারে রোগ না হয়—সাংখ্য ইহারই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা কি সম্ভব? সাংখ্য বলেন—হাঁ; আমার যুক্তি শ্রবণ কর। আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ। এই দুইয়ের একটা অস্বাভাবিক সংযোগে রূপরসাত্মক ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়। সেই ব্যক্ত জগতে সুখ ও দুঃখ নামক দুইটা সামগ্রী

দেখা যায়। তোমাদের যত কিছু দুঃখ সেই রূপরসাদির অনুভবসাপেক্ষ। যদি সেই রূপরসাদির অনুভব না হয় —তাহা হইলে তদপেক্ষিত সুখদুঃখের অনুভবের সম্ভাবনা কি? অতএব প্রকৃতিপুরুষের বর্ত্তমান সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেলেই দুঃখেরও অবসান হইবে।)

ইহার কি অর্থ এই যে, মৃত্যুই জীবনের লক্ষ্য? মরিলে ত প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ ঘুচিতে পারে?

এইখানেই গোল। সাংখ্য বলেন, প্রকৃতিপুরুষের বর্ত্তমান সম্বন্ধ কিরূপে সংসাধিত হইল—তাহা আমরা অবগত নহি। সুতরাং মরিলেও যে সেই সম্বন্ধ ঘুচিবে তাহার প্রমাণ কি? স্থূল দেহ বিনষ্ট হইলেও আত্মার একটী সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীর থাকা সম্ভব। তবে উপায়?

সাংখ্যেরা বলেন, আত্মা যে অবস্থায় দুঃখ অনুভব করে, তাহার নাম "বদ্ধভাব"। যে অবস্থায় দুঃখ অনুভব অসম্ভব, তাহার নাম "মুক্তভাব"—"মোক্ষ" বা "মুক্তি"। আত্মা যদি স্বভাবতঃ "বদ্ধ" হয়, তবে মুক্তি অসম্ভব।

"ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ। স্বভাবস্য অনপায়িত্বাৎ অননুষ্ঠানলক্ষণম্ অপ্রামাণ্যং স্যাৎ।" ১। ৭—৮

মুক্তিবিষয়ক শাস্ত্রও তাহা হইলে অননুষ্ঠেয়তা দোষে দূষিত হইবে। কিন্তু আত্মা স্বভাবতঃ "বদ্ধ" নয়।

"ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগঃ তদ্যোগাৎ ঋতে।—১।১৯

আত্মা স্বভাবতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। দুঃখের সহিত যোগ কেবল প্রকৃতির সহিত যোগজন্য। অনেক বিচারের পর সাংখ্যেরা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন —যে, "অবিবেক" বা প্রকৃতি পুরুষ যে ভিন্ন এই জ্ঞানের অভাব বশতই আত্মা বদ্ধভাবাপন্ন হয়। দেহকে যতদিন মনুষ্য আত্মা বলিয়া ভ্রান্ত হয়, ততদিন দুঃখ পায়।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, দেহ ও আত্মা ভিন্ন বুঝিলেই কি আমাদের দুঃখের অবসান হইবে? তাহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন, তা কিরূপে সম্ভব?

"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদ্ অপরোক্ষাদ্ ঋতে॥ ১।৫৯

যখন কাহারও একবার দিক্‌ভ্রম হয়, সে উত্তরকে দক্ষিণ ভাবে—হাজার তাহাকে উত্তর বল—হাজার সে বুঝুক যে ইহা উত্তর বটে, তবু তাহার দক্ষিণত্ব প্রতীয়মান যায় না। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য্যকে পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ প্রতিপন্ন করিলেও, তাহা সেই যেমন চিরকাল থালাখানার মত দেখা অভ্যাস, তেমনিই দেখা যায়। তেমনি কেবল

যুক্তির দ্বারা দেহ আত্মার ভেদ উপলব্ধি করিলেও দুঃখের অবসান নাই। কিন্তু তাহার পরেও তাহা পূর্ব্বের ন্যায় অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিবে।

অতএব মুক্তির জন্য বিবেক-সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন। দীর্ঘকালব্যাপী ক্লেশকর তপস্যার মধ্যে অবস্থিত হইয়া সমাধি বা ধ্যানের দ্বারায় বিবেক-সাক্ষাৎকার হয়। যুক্তি দ্বারা উপলব্ধি একপ্রকার, আর সাক্ষাৎকার দ্বারা উপলব্ধি আর এক প্রকার। দিঙ্মূঢ় ব্যক্তি যুক্তি দ্বারা দক্ষিণকে দক্ষিণ বুঝিলেও—কিয়ৎকাল তাহাকে উত্তর বলিয়া পরিগ্রহ করিতে থাকে। অবশেষে হঠাৎ কোনও সময়ে তাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গিয়া দক্ষিণকে দক্ষিণ বলিয়া সাক্ষাৎকার উপলব্ধি হয়; যখন দেহ আত্মা ভেদ সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ "সাক্ষাৎকার" সংজ্ঞক-ভেদ-জ্ঞান হয়,—তখনই আমাদের দুঃখের অবসান সম্ভব। তপস্যাযুক্ত ধ্যানই এই অবসানের উপায়। (১) ইহা হইতেই তপস্যাযুক্ত যোগাভ্যাসের উৎপত্তি।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, সাংখ্যদর্শন এ

(১) উত্তাপে থাকিয়াও যখন উত্তাপ বোধ হয় না —অথচ চৈতন্য বিদ্যমান, তখনই বিবেক-সাক্ষাৎকার হইয়াছে, বলা যায়।

স্থলে দর্শনের সীমা ছাড়াইয়া, কল্পনার সীমায় গিয়া পড়িয়াছে। একশত বৎসর তপস্যা করিলেও, আমাদের ক্ষুৎপিপাসা বা শীতাতপের ক্লেশের যে অবসান হইবে, তাহার প্রমাণ নাই। কপিল অবিবেকী ব্যক্তিকে "অবুদ্ধ"—ও সাক্ষাৎকৃত-বিবেক ব্যক্তিকে "বুদ্ধ", এই সংজ্ঞা প্রদান করেন। আত্মা স্বভাবতঃ "বুদ্ধ" বলিয়া তিনি খ্যাপন করেন। আত্মার এই স্বাভাবিক অবস্থা কোনও কারণে বিকৃত হওয়ায় আমরা "অবুদ্ধ" হইয়াছি। কিরূপে সেই স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহার মতে তাহারই চেষ্টা কর্ত্তব্য।

তাঁহার উপদেশে মোহিত হইয়া, অনেকে তপস্যা দ্বারা "বুদ্ধ" হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংসারে ভণ্ডের অভাব নাই।—কিন্তু সিদ্ধার্থ গৌতম নামক এক নিরতিশয় সত্যপ্রিয় অমায়িক মহাপুরুষ পরীক্ষা করিয়া সংসারে প্রচার করিলেন যে,—তপস্যাতে যাতনার ও ক্লেশের অবসান না হইয়া তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এক পক্ষে সিদ্ধার্থও কপিলের যুক্তির ঘোরে থাকিয়া গেলেন। আত্মা যে স্বভাবতঃ "বুদ্ধ" ও মুক্ত, বুদ্ধ হইলেই যে মুক্ত হওয়া যায়, এ সংস্কার তাঁহার

থাকিয়া গেল। তবে তাঁহার মনে হইল যে, "তৃষ্ণার" নির্ব্বাণ হইলেই—অর্থাৎ সংসারে ভোগবাসনার বিলোপ হইলেই, বুদ্ধ অর্থাৎ বিশুদ্ধচৈতন্যময় হওয়া যায়—এবং মনুষ্য মুক্ত হয়। তিনি রাজপুত্র হইয়াও, রাজ্যত্যাগ করিলে তাঁহার যে তৃষ্ণার নির্ব্বাণ হইয়াছে, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিল না। অতএব তিনিই সংসারে প্রথম "বুদ্ধ" বলিয়া বিখ্যাত হইলেন; এবং কপিল যাহাকে মোক্ষ বলিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে নির্ব্বাণ আখ্যা প্রাপ্ত হইল। অতঃপর কিরূপে সুখদুঃখের হাত এড়াইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যময় হওয়া যায়,—কিরূপে "নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব" পুনর্লাভ করা যায়,—তাহাই কিছুকাল মানবজীবনের লক্ষ্য হইল।

দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সম্ভব কি না, ইহা দর্শন-শাস্ত্রের অতীত কথা। ঋষিরা সোমযাগের দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত-বিনাশসম্ভাবনার উপদেশ দিতেন,—কপিল তাহার বিরোধী হইয়া তপস্যার পন্থা প্রচার করেন। তিনি বলিলেন, "দীর্ঘকাল শীতাতপের মধ্যে, ক্ষুৎপিপাসার মধ্যে, আমার বিবেক-মার্গের অনুশীলন কর,—আত্মা যে দুঃখের অতীত, কঠোর দুঃখের কারণের মধ্যে থাকিয়া, তাহার সাক্ষাৎ-

কারের চেষ্টা কর,—যাহা যুক্তি দ্বারা বুঝিলে, তাহা অনুভব কর,—তখন চিরকালের জন্য দুঃখের অবসান হইবে।” সিদ্ধার্থ দেখিলেন, তাহা ঠিক নয়। তিনি বৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন। কিন্তু মনুষ্য এ পর্য্যন্ত কোন মনুষ্যকেই দুঃখের পারগামী দেখিল না।

নব্য দর্শনশাস্ত্র হইতে “স্বর্গ”, “মোক্ষ”, বা “নির্ব্বাণ” শব্দকে দূরীভূত করিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রের সীমায় মনুষ্যকে সুখদুঃখের অধীন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। বুদ্ধ ও কপিল উভয়েই ভ্রমে পড়িয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রের সীমার মধ্যে আশা ও আস্বাসের সমাচার এই যে, প্রকৃতিপুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে কেহই অন্যের দাস নহে। প্রকৃতির দাসত্বে আমাদের ক্ষুৎপিপাসা ও রোগ ও জরা ও মৃত্যু অপরিহার্য্য বটে—কিন্তু প্রকৃতি আমাদের এতটুকু আয়ত্তাধীন যে, আমরা যত্ন করিলে ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতে পারি,—বুঝিয়া চলিতে পারিলে রোগের হস্ত অনেক এড়াইতে পারি,—অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুও এড়াইতে পারি। জরা মৃত্যু অপরিহার্য্য বটে,—কিন্তু জরার পূর্ব্বে জীবন নিতান্ত মন্দ নয়। প্রকৃতির রূপও

মনোহর, এবং অদ্ভুত সৌন্দর্য্যময় ; সেই রূপ দর্শনের শক্তি যে আমাদের হইয়াছে, ইহাও অল্প লাভের বিষয় নহে। কিসে দুঃখের অপচয় ও সুখের উপচয় হইবে, দর্শনশাস্ত্র সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতে আমাদিগকে উপদেশ দেয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন,—"মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়!" অভ্রান্ত দর্শনশাস্ত্রও জীবন-সংগ্রামের মধ্যে মনুষ্যকে বলে,—"মা ক্লৈব্যং গচ্ছ মানব!" কপিলের দর্শন—সিদ্ধার্থ গৌতমের দর্শন, এ স্থলে উভয়েই ভ্রান্ত ; উভয়েই মনুষ্যের বীরত্বের হানি-জনক ; ক্লীব-ভাবের উৎপাদক। (১) কপিলের তপস্যা বা যোগপন্থা, বুদ্ধের বৈরাগ্যপন্থা, উভয়েই মনুষ্যকে বিপথগামী করে। তদপেক্ষা প্রাচীন ঋষিরা যে বলিতেন,—

"জীবনং খলু সংগ্রামো বৃত্রহা তত্রচেশ্বরঃ।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।"

---

(১) ব্রাহ্মণেরা সেই জন্যই কপিলদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন তুল্য হেয় বোধ করেন। তাঁহারা বলেন, "সাংখ্যশাস্ত্রমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।"

ইহাতেই বরং মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষা পায়। জীবনের আততায়ী শীতাতপের বেশেই সমাগত হউক, ম্যালেরিয়া জ্বরের বেশেই আগত হউক, কিংবা আক্রমণকারী কসাক সৈন্যরূপেই আগত হউক, তাহার সহিত যুদ্ধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। অশিক্ষিত কৃষক ও সিপাহী সহজ বুদ্ধির প্রভাবে এ বিষয়ে কপিল ও সিদ্ধার্থ অপেক্ষা সুপণ্ডিত, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রই আমাদের যথার্থ উপাস্য দেবতা।

সমাপ্ত।

"সাংখ্যদর্শন" সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র

পাতিসর, আত্রাই।
N. B. S. Railway.

সপ্রীতি নমস্কার নিবেদন—

আপনার সাংখ্যদর্শন পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর বিপুল আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা পুনশ্চ আপনাকে কৃতজ্ঞচিত্তে জানাইলাম। বঙ্গ-ভাষায় আপনার এ রচনার আর তুলনা নাই। বড় ইচ্ছা ছিল মালদহে উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় লাভ করিব এবং সশরীরে আপনাকে সাধুবাদ দিয়া আসিব কিন্তু ব্যস্ততা বশতঃ সে কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইল—কোন এক সময়ে পরিচয়ের অবসর হইবে এরূপ আস্বাস রহিল। সাক্ষাৎ পরিচয় থাক্ বা না থাক্ আমাকে আপনার একটি ভক্ত পাঠকের মধ্যে গণ্য করিয়া লইবেন এবং ভবিষ্যতে কালক্রমে যদি আপনার বন্ধুশ্রেণীর মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইতে পারি তবে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। "সাহিত্যে" আপনার যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইতেছে তাহা আমি সবিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকি জানিবেন। অবশেষে সবিনয় নিবেদন এই যে আপনি যে পাঠকের বিরাগ ও শ্রান্তির আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা মন হইতে দূর করিবেন। * * * *। ইতি

১৯ চৈত্র, ১৩০০।

ভবদীয় ভক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

THE CALCUTTA GAZETTE : 18th. July, 1900.

"Is an extremely interesting and original exposition of principles of *Sankhya Philosophy* based mainly on aphorisms of Kapila and differing fundamentally from views of standard authors on the subject * * * There is no denying, that the book contains evidence of clear thinking, close reasoning and an honest and fearless devotion to truth, which is rarely met with an equal degree in the writings of any other Bengali author of the present day. The writer's untimely death has been great loos to Bengali literature."

নব্য-ভারত :—চৈত্র, ১৩০৬। * * * "জটিল দার্শনিক বিষয় প্রাঞ্জল বাঙ্গালায় লিখিতে পারেন, এরূপ দুই চারি জন পণ্ডিতের এ দেশে অভ্যুদয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে উমেশচন্দ্র অন্যতর। উমেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য এ দেশের পণ্ডিত সমাজের নিকট সুবিজ্ঞাত। উমেশচন্দ্রের অসাময়িক মৃত্যুতে বঙ্গভাষার যে অনিষ্ট হইয়াছে, শীঘ্র তাহা পূরণ হইবে না। উমেশচন্দ্রের উপযুক্ত পুত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বটব্যাল মহাশয়, পিতৃদেবের কীর্ত্তি সংরক্ষণের জন্য, "সাধনায়" প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধ সকল সংগ্রহ করিয়া, এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সুরেন্দ্রনাথের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই গ্রন্থ শুধু তাঁহার পিতৃদেবের কীর্ত্তি নয়, বঙ্গভাষার অক্ষয় কীর্ত্তি। * * * এই পুস্তকখানি আমূল পাঠ করিলে বুঝা যায়, সাংখ্যদর্শনখানিকে কিরূপ আত্মস্থ করিয়া বটব্যাল মহাশয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় বড় অধিক নাই। গভীর পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে।"

বসুমতী ঃ—৫ই মাঘ, ১৩০৬। * * * "সেই প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল আর ইহজগতে নাই। সরকারী কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি বেদ, বেদান্ত, দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন, এবং তাঁহার সেই গভীর পরিশ্রমের ফলে বঙ্গভাষার সাহিত্যভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছিল। "সাধনা" নামক মাসিক পত্রিকায় তিনি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখেন, তাহাই তাঁহার পুত্রগণ ছাপাইয়া দিয়াছেন। অতি সহজে মোটা কথায় কুটকচালে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা বঙ্গের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্গীয় বটব্যাল মহাশয় ব্যতীত আর কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই নবেল নাটক প্লাবিত দেশে "সাংখ্য-দর্শনে"র আদর হইবে কি ?"

হিতবাদী ঃ—২৪এ কার্ত্তিক, ১৩০৭। "স্বর্গগত ৺ উমেশচন্দ্র বটব্যাল সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ইহা ভূমিকাদি সমেত সে গুলির গ্রন্থাকারে সঙ্কলন। বটব্যাল মহাশয় স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করিতেন, নির্ভীক হৃদয়ে মতামত প্রকাশ করিতেন, প্রশংসা বা নিন্দার মুখাপেক্ষা করিয়া কিছু বলিতেন না। এ গুণ বাঙ্গালী জাতিতে দুর্ল্লভ। * * * কাজেই "সাংখ্যদর্শন" সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধগুলির গ্রন্থভাবে প্রচার আমাদিগের নিকট অতিশয় প্রীতিকর বোধ হইয়াছে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।"

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ., ডি. এল্., মহাশয় বলেন,— * * * * "এই গ্রন্থে সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্বগুলি যেরূপ সংক্ষেপে ও সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে সেরূপ বিশদ ব্যাখ্যা অতি বিরল। বাঙ্গালা ভাষায় দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক অতি অল্পই আছে; সুতরাং এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর বড় আদরের দ্রব্য এবং ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবার অধিকারী।"